দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

আমেরিকা ও চীনের দড়ি টানাটানির মাঝে শক্তিধর ভারতের আত্মপ্রকাশ — পৃঃ ২৩

বিশ্ব-বাণিজ্যে ট্রাম্পের দাদাগিরি রুখবেন বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদী — পৃঃ ১৯

৭৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ২৫ আগস্ট, ২০২৫।। ৮ ভাদ্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

মার্কিন চাপে মাথা নোয়াবে না ভারত

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ২ সংখ্যা, ৮ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৫ আগস্ট - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বাঙ্গালির ভুলে থাকা নিরাপত্তাহীনতাকে ভোটের পসরা করছেন মুখ্যমন্ত্রী অবাক 'বাংলা' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

জয় করেও ভয় কেন দিদির? ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনায় বিস্ময়ের উদ্রেক না হওয়াই স্বাভাবিক ◻ ড. শেখর প্যাটেল ◻ ৮

ভারত-আমেরিকা দ্বৈরথ : সমস্যা সমাধানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

নির্বাচন কমিশনের সদর্থক ভূমিকা ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে ◻ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ◻ ১১

ভারতের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধ : আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব ◻ বিমলশঙ্কর নন্দ ◻ ১৩

নবান্ন অভিযানের জবাবে : ৭ জানুয়ারি বনাম ৯ আগস্ট ◻ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ◻ ১৬

বাঙ্গালি ও বাং-আলির সন্ধি হলো কাঁঠালের আমসত্ত্ব ◻ অরিন্দম ভট্টাচার্য ◻ ১৭

বিশ্ব বাণিজ্যে ট্রাম্পের দাদাগিরি রুখবেন বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদী ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ১৯

আমেরিকা ও চীনের দড়ি-টানাটানির মাঝে শক্তিধর ভারতের আত্মপ্রকাশ ◻ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ◻ ২৩

মনসাপূজা ও রাঢ় অঞ্চল ◻ প্রবীর কুমার রায় ◻ ৩১

তারকেশ্বরের শ্রাবণীমেলা ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩২

তেল, প্রযুক্তি ও কূটনীতি—বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে ভারতের সাফল্য, জয়যাত্রা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দুয়ার খুলে দেবে ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ৩৫

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কারও বিরোধী নয়, দেশসেবাই তাদের মূলমন্ত্র ◻ অমিত কুমার চৌধুরী ◻ ৪৩

ব্যাক বেঞ্চারস সেলুলয়েডীয় আলোড়ন! ◻ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় ◻ ৪৫

১৬ আগস্ট : খেলা হবে দিবস নাকি 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনের রক্তস্মৃতি? ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৮

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০** ◻ **খেলা : ৩৮** ◻ **রঙ্গম : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
১ সেপ্টেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১ সেপ্টেম্বর
২০২৫

শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাহীন নৈরাজ্য

চরম দুর্নীতি আর অনিয়মের পাঁকে নিমজ্জিত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা। ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর চাকরি বাতিল। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার চার মাস পরেও রেজাল্ট নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। ওবিসি সংরক্ষণ-কে অজুহাত করে কলেজে ভর্তি স্থগিত। দিশাহারা পড়ুয়ারা। আর এই সুযোগে বেসরকারি কলেজগুলো মোটা টাকার বিনিময়ে রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে ব্যবসা। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারত-আমেরিকা শুল্কযুদ্ধ

১৭৭৬ ও ১৯৪৭ সালে যথাক্রমে স্বাধীনতা লাভ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি পরিণত গণতন্ত্র এবং ভারত হইল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী পর্যায় হইতেই মিত্রশক্তি জোটের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি রূপে অভ্যুদয় ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় ঘোষণা মাত্রই বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি ও সামরিক শক্তি হইয়া ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৪৫ পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমি বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করে সমগ্র বিশ্ব। এই পর্বে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ফিরিয়া আসে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করিয়া। গ্যাট চুক্তি, ডাঙ্কেল প্রস্তাবের দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব খর্ব হইয়াছে এই অভিযোগে বিশ্ব জুড়িয়া ব্যাপক আলোড়নও সৃষ্টি হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে গঠিত হয় 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'। ইহার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। তাহার বিশ্বব্যাপী প্রভাব বজায় রাখিতে শুরু হইতেই কয়েকটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাহাদের দেশীয় মুদ্রা হইল মার্কিন ডলার। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময় মাধ্যম হইল মার্কিন ডলার। বিশেষত খনিজ তেলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ বা জ্বালানির ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারে আমদানি-রপ্তানি বাধ্যতামূলক। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সূচিত হইতেছে বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তন। মার্কিন আধিপত্যের বিপ্রতীপে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে অধুনা বিশ্ব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমশ গুরুত্বহীন হইয়া পড়িতেছে মার্কিন ডলার। অর্থনীতির পরিভাষায় বর্তমান বিশ্বে 'ডি-ডলারাইজেশন'-এর প্রক্রিয়া চলিতেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই ডলারের অবমূল্যায়ন রুখিতে এবং অর্থনৈতিক একাধিপত্য ধরিয়া রাখিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক অবরোধমূলক নানা ব্যবস্থা তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। কখনও কোনো দেশের সুইফট্ কোড বাতিল করিয়াছে, কখনও বিভিন্ন দেশ বা বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি ফ্রিজ করিয়াছে, কখনও কোনো দেশের উপর অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছে, কখনও কোনো দেশকে বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের ঋণদানে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, কখনও বা বিভিন্ন দেশ হইতে পণ্য-পরিষেবা আমদানির ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বা টারিফ আরোপ-পূর্বক সেই দেশগুলির অর্থনীতিতে সরাসরি আঘাত হানিবার প্রয়াস করিতেছে।

২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সূত্রপাত হইলে রাশিয়া হইতে খনিজ তেল আমদানিতে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক জারি নয় বলিয়া রাশিয়া হইতে খনিজ তেল আমদানি অব্যাহত রাখে ভারত। ইহার পরিণামস্বরূপ, সম্প্রতি বিভিন্ন ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিতান্তই কিছু সংখ্যা কিংবা কাস্টমস্ ডিউটি বাবদ কিছু অতিরিক্ত ডলার প্রদান অথবা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অর্থপ্রদানের হিসাব বা রসিদের বিষয় নহে এই শুল্ক। বৃহৎ আমদানিকারী শক্তির দ্বারা প্রণীত এহেন শুল্কনীতি বা বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার উপর আরোপিত এই মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বিশ্ব-অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে একটি অর্থনৈতিক ভূমিকম্পস্বরূপ। অর্থনীতির গণ্ডি অতিক্রম পূর্বক ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিবিধ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়াছে ট্রাম্প-প্রশাসন প্রণীত এই শুল্কনীতি। ইহার অভিঘাতে শুধু ভারত নহে, অন্যান্য অনেক দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি হইয়া উঠিয়াছে বাণিজ্যবিমুখ। উল্লেখ্য, বিশ্ব জুড়িয়া যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্পেন ও সুইটজারল্যান্ডের মতো দেশের উপরেও নির্ধারিত হইয়াছে অতিরিক্ত মার্কিন শুল্ক। ইহার ফলে মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে দুইটি দেশ। কানাডা ও ভারত আমেরিকা হইতে যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। শুল্কনীতি পর্যালোচনার অভাবে সমস্যার মীমাংসা সূত্র অদ্যাবধি অধরা। কূটনৈতিক স্তরে আলাপ-আলোচনার অভাবে সহযোগী ও মিত্র দেশগুলির সঙ্গেও আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটিতেছে। দেশগুলি বর্তমানে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিকল্প শক্তির সন্ধানরত। আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র সরবরাহ ব্যবস্থা বর্তমানে তাহার গতিপথ পরিবর্তন করিতেছে। ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে ভুক্তভোগী বহু দেশ আমেরিকার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তা— দুই ক্ষেত্রেই ওয়াশিংটনের নির্ভরযোগ্যতা প্রায় শূন্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে। পক্ষান্তরে 'মার্কিন শুল্কনীতি' সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রতিযোগীদের প্রতি বড়ো উপহারস্বরূপ হইতে চলিয়াছে।

সুভাষিতম্

যস্য ত্বেতানি চত্বারি বানরেন্দ্র যথা তব।
ধৃতির্দৃষ্টির্মতির্দাক্ষ্যং স কর্মসু ন সীদতি।। (বাল্মীকি রামায়ণ ৫।১।১৯৮)

হে বানরেন্দ্র! যার মধ্যে আপনার মতো ধৈর্য, দূরদর্শিতা, বুদ্ধি ও কুশলতা রয়েছে, সে কখনো কোনো কাজে নিরাশ হয় না।

বাঙ্গালির ভুলে থাকা নিরাপত্তাহীনতাকে ভোটের পসরা করছেন মুখ্যমন্ত্রী

অবাক ‘বাংলা’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কবিকে ধার করে লিখছি। অবাক লাগে তৃণমূলের মাত্র দু'বারের সাংসদ নির্বাচন কমিশনকে জ্ঞান বিতরণ করছেন। তৃণমূলকে দল হিসেবে বেছে নেওয়ায় এটাই রাজ্যের মানুষের ভবিতব্য। তা না হলে তদন্ত সংস্থার চার্জশিটে নাম থাকা নেতা সবার মাথার উপর বসে যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র তৃণমূল নেতা যাঁর চার্জশিটে নাম রয়েছে অথচ গ্রেপ্তার বা আটক হননি। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০২০ পর্যন্ত বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন তৈরি করলেও ২০২০-র ডিসেম্বরে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যোগদান সেই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।

সিপিএমকে সরাতে মমতা গোষ্ঠীর সময় লেগেছিল বিশ বছর। তবে মমতা ব্যানার্জি সিপিএমকে সরাননি। গোহারা হেরে সিপিএম তৃণমূলের থেকে আট শতাংশ কম ভোট পেয়েছিল। ২০১১-তে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসের সঙ্গে খেলায় ইতি টানেন। এখন ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেসকে বিষাক্ত মনে করেও লোক দেখানো সখ্য বজায় রাখেন। তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএমের অদ্ভুত মিল। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার ১৫ বছরের ভিতর সিপিএম কোনো জনআন্দোলন গড়তে দেয়নি। যেমন ১৯৫১-৫২ সালের তেভাগা আন্দোলনের ২০ বছরের মধ্যে বিদেশি বামপন্থীরা কোনো কৃষক আন্দোলন করতে পারেনি। ফাঁকতালে কিছু খোকা মাওবাদী রাজ্যে ভাঁড়ামির রাজনীতি শুরু করে।

১৯৯৩-এর আগে মমতা ব্যানার্জির কোনো প্রভাব রাজ্য রাজনীতিতে ছিল না। আর এখন তাই অবাক করা প্রশ্ন উঠছে জনমানসে, চোরের দল হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েও তৃণমূল কি করে দুটি জাতীয় আর দুটি রাজ্য নির্বাচন জিতল? তাহলে বলতেই হবে সাড়ে সাত কোটির অর্ধেক ভোটারকে মুগ্ধ করে রেখেছে তৃণমূল, মানুষ করেনি। নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জির পরাজয় রাজ্যের মানুষ ভুলে গিয়েছে। বলা ভালো ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে অভিষেকবাবুর বিতর্কিত জয় একরকম। অবাক লাগে এ রাজ্যের মানুষ কীসে ভরসা রাখেন? কেবল রেউড়ি। এমনটা যে ঘটতে পারে না সে দাবি করছি না। তৃণমূল ১, কংগ্রেস ৩, আর বিজেপি ২১টি রাজ্য শাসন করে। তবু রাহুল গান্ধীর মতো অপরিণত বুদ্ধির নেতারা অভিষেকবাবুর মতোই ভোট নিয়ে এক্তিয়ার বহির্ভূত প্রশ্ন তোলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অন্তঃসারশূন্য অভিযোগ তুলছেন রাহুল। ভারতে মার্কিন ‘ডিপ স্টেট’ যে সক্রিয় তার বড়ো প্রমাণ রাহুল। এর আগে ছিল বাংলাদেশের আধা শাসক মহম্মদ ইউনুস। এরা দেশের বাইরে থেকে দেশ চালায়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, অভিষেকবাবুও কি ওই ভারত বিরোধী দলে নাম লিখিয়েছেন? তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সিপিএম নেতারা ডিপ স্টেট আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দোষী করেছিল। তারাই নাকি মমতা ব্যানার্জির উত্থান ঘটায়। জ্যোতিবাবুকে সরিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সামনে এনে সিপিএমের ভরাডুবি হয়। অভিষেককে সামনে এনে মমতা ব্যানার্জি সেই ভুল করছেন কিনা তা ২০২৬ সালের ভোটেই বোঝা যাবে। বালক-বুদ্ধি রাহুল ভোট চুরির আজগুবি গল্প ছড়িয়েছেন কিন্তু হলফনামা দিচ্ছেন না। নেহরু থেকে রাহুল পর্যন্ত গান্ধী-পরিবার চিরকাল ভারতের সব প্রতিষ্ঠান, এমনকী সংবিধানকেও বাড়ির রান্নাঘর ভাবেন।

> **তৃণমূল জমানায় হিন্দু বাঙ্গালি আর বাংলাভাষা যে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, মমতা ব্যানার্জি তা রেউড়ি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। সময়ের সঙ্গে সে মুখোশ খুলে পড়ছে। হিন্দু ঐক্যের যে ডাক বিজেপির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তা মুসলমান বিরোধী বলে মমতা পসরা সাজিয়েছেন। সিপিএম তিন দশক ধরে তাই করেছিল।**

তৃণমূলও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটাই বলে। অভিষেকবাবু তার কেন্দ্রের একটি ভিডিয়ো বিজেপি নেতাদের পাঠিয়েছেন। রাজ্যের মানুষের এটা বলার সময় হয়েছে তাঁরা ‘অবাক’ নন। ‘সবাক’ হয়েই মমতার মেকি নিরাপত্তার জাল তাদের কাটতে হবে। তৃণমূল জমানায় হিন্দু বাঙ্গালি আর বাংলাভাষা যে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, মমতা ব্যানার্জি তা রেউড়ি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। সময়ের সঙ্গে সে মুখোশ খুলে পড়ছে। হিন্দু ঐক্যের যে ডাক বিজেপির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তা মুসলমান বিরোধী বলে মমতা পসরা সাজিয়েছেন। সিপিএম তিন দশক ধরে তাই করেছিল। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়েই ভোটেই জিতত। তিন দশকের কংগ্রেস শাসনকে গুরুত্ব দেওয়া তাই মূর্খামি। আটচল্লিশ বছর ধরে যে সংকট রাজ্যে চলেছে তা কাটাতে ভোটারদের এবার সবাক হতেই হবে। হয়তো এটাই শেষ সুযোগ।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

জয় করেও ভয় কেন দিদির?

ভীতুশ্রী দিদি,

রাগ করলেন নাকি! আপনার অনুপ্রেরণাতেই এই সম্বোধন। আপনি যেমন সব কিছুতেই 'শ্রী' যুক্ত করেন তেমনই করলাম। 'শ্রী' মানে সুন্দর। আর আপনার এই ভয়টা সত্যিই সুন্দর। কিন্তু আর কত ভয় পাবেন বলুন তো আপনি? ভোটার তালিকা নিয়ে ভয়, নানা মামলায় আদালতের রায় নিয়ে ভয়। সে নয় ঠিক আছে, কারণ সেই অন্যায়গুলো আপনি বা আপনার সরকার বা আপনার দল করেছে। কিন্তু দিদি কিন্তু ১৯৪৬ সালে তো তৃণমূল ছিল না। আপনারও তো মর্ত্যে আবির্ভাব হয়নি! তবে সেই ঘটনা নিয়ে সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ কেন বন্ধ করে দিল আপনার পুলিশ? কলকাতায় ঠিক কী কী ঘটেছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট। যার জন্য ৭৮ বছর পরেও আপনি ভয় পাচ্ছেন?

পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস্' চলচ্চিত্রের টিজার প্রকাশ্যে আসার পরেই তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন আপনার দলের এক নেতা। আর কলকাতায় ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠান বানচাল করে দিল আপনার পুলিশ। সংবাদমাধ্যমের সামনে পরিচালক বিবেকের সঙ্গে পুলিশ খারাপ ব্যবহার করেছে। একটা ট্রেলার লঞ্চ নিয়ে এতো ভয় কেন? ওই গণহত্যার খলনায়কের নাম হোসেন সইদ সুরাবর্দি। এটা ঐতিহাসিক সত্য। তবে কি সুরাবর্দির পরিচয় নিয়েই আপনার ভয়? দুধেল গাইয়েরা রেগে যেতে পারেন? কিন্তু ইতিহাস তো ইতিহাস। এই যে আপনি লন্ডনে গেলেন। ওরা কত খাতির করল। তা বলে কি ব্রিটিশদের অত্যাচারের ইতিহাস বলা যাবে না! সাত খুন মাফ হয়ে গেল! সেটা তো নয়।

আপনার দল বলছে, 'গুজরাট ফাইলস্' কেন বানানো হয়নি। হয়েছে দিদি হয়েছে। অনেক হয়েছে। এখনই আমার যে কটা নাম মনে পড়ছে তার মধ্যে কাই পো চে, পারাযানিয়া, ফাইনাল সল্যুশন, ফিরাগ, দ্য সবরমতি রিপোর্ট অনেক ছবিই হয়েছে। প্রতিটি ছবিতেই নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়েও ছবিগুলি রমরমিয়ে চলেছে। কেউ বাধা দেয়নি। আর 'বেঙ্গল ফাইলস্' তো ৭৮ বছর আগের ঘটনা। তাহলে ভয় কোথায়? তাছাড়া ক'দিন পরে ছবিটা যদি কোনো ওটিটি-তে চলে আসে তখন? বাধা দিতে পারবেন আপনি?

দিদি, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কলকাতায় কোনো দাঙ্গা হয়নি ১৯৪৬ সালে। সেটা ছিল 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস'। নির্মম হিন্দু নরসংহার। সেই সময়ে কলকাতায় যত মানুষের নিধন হয়, যত সম্পত্তি ধ্বংস হয়, অতীতে তার নজির মেলে না। ওই ঘটনার পরেই মুসলিম লিগ এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশের দেশভাগের পরিকল্পনায় সায় দেয়। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সমর্থন দিলেও তৃণমূল সেই সময়ে দেশভাগে সমর্থন দেয়নি। কারণ, আপনারা তো ছিলেনই না।

মুসলিম লিগ আগেই ১৬ আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করে। হত্যালীলা শুরুর দিন বঙ্গপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। ১৬ আগস্ট দুপুরের পর থেকেই পরিস্থিতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল পুলিশ। বিকেল তিনটের মধ্যে পুলিশ কমিশনার ফোন করে গভর্নরকে অনুরোধ করেন সেনা নামাতে। অনুরোধ খারিজ করা হয়। অনেকে এটাও বলেন যে সুরাবর্দির নির্দেশ মতোই কাজ করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার সিক্সস্মিথ।

দিদি, কলকাতা পুরসভা তখন প্রতি শনিবার একটি করে গেজেট প্রকাশ করত। তার ৪৫তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৪ আগস্ট, ১৯৪৬। সেখানে যা লেখা রয়েছে তাতে কলকাতা, হাওড়ার রাস্তা থেকে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল ৩ হাজার ৪৬৮টি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন মৃত্যুর সংখ্যা কোনোমতেই ১০ হাজারের কম ছিল না।

কলকাতায় প্রতিরোধ গড়ার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শুনেছি বিবেকের ছবিতে সেই কাহিনি রয়েছে। পারিবারিক মাংসের ব্যবসা থাকায় তিনি 'গোপাল পাঁঠা' নামে বেশি পরিচিত। প্রতিরোধ গড়তে তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'হিস্ট্রোরি অব মর্ডান বেঙ্গল', পার্ট-২ থেকে জানা যায়, ১৯৪৬-এর ১৫ আগস্ট রাতেই মুসলিম লিগের গুন্ডা বাহিনী কলকাতার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে মিছিল করে জেহাদের ডাক দেয় এবং 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগান তোলে। একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়, কলকাতার সুরঞ্জন দাসের 'Communal Riots in Bengal 1905-1947' গ্রন্থে। কলকাতার বিভিন্ন পার্কের রেলিং ভেঙে সেই লোহা দিয়ে অস্ত্র বানানো হয়। কামারদের দিয়ে ছোরা, বল্লম ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করিয়ে নেওয়া হয়, ছোরাছুরি শান দেওয়ার কাজ চলতে থাকে।

মুসলমান ছাত্রদের হোস্টেলে কেরোসিন, মেথিলেটেড স্পিরিট ও অস্ত্র জমা করা হয়। মুসলমানদের দোকানে দাগ দিয়ে রাখা হয়, যাতে সেগুলো লুঠপাটের শিকার না হয়। মুসলিম লিগ সরকারের তরফ থেকে লিগ ক্যাডারদের পেট্রোল ও কেরোসিন জোগান দেওয়া হয়। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৫৩) লেখা হয় কীভাবে আক্রমণ হয়েছিল। বলা হয়, মুসলমানদের পক্ষ থেকে একতরফা নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের 'পর হিন্দু ও অন্যান্য লোকেরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে।'

আমি বলি কী, ভয় যখন পাচ্ছেন তখন সব কিছু একেবারে নির্মূল করে দিন। শুধু এই নতুন ছবিটা নয়, পারলে বাকি যে বইগুলোর কথা লিখলাম সেগুলো নিষিদ্ধ করে দিন। দিদি, আপনাকে বলে রাখি, ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়ে পারলে জাতির মেরুদণ্ড বেঁকে যায়। কিনে নিন দিদি, কিনে নিন। ভাতা দিয়ে দিয়ে বাঙ্গালির শিরদাঁড়া কিনে নিন। □

অতিথি কলম

ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনায় বিস্ময়ের উদ্রেক না হওয়াই স্বাভাবিক

ড. শেখর প্যাটেল

আমেরিকা হলো একটি অত্যন্ত লোভী দেশ, যা আধুনিক কালের 'রাবণ' হিসেবে ক্রিয়াশীল। প্রশ্ন হলো ভারত কি আমেরিকা নামক দশাননের অন্যতম একটি মস্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, নাকি বিভীষণ বা শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করবে?

নিজের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এসে আজ উপনীত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইতিহাসের এই মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে দেশটি এই মুহূর্তে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই সমস্যাগুলি বর্তমানে আমেরিকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রায় বিপন্ন করে তুলেছে।

আমেরিকার আর্থিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশটির ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। অর্থনৈতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী এক দশকে আরও কয়েক ট্রিলিয়ন (লক্ষ কোটি) ডলার ঋণবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে ঋণভারে বিপর্যস্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। সেই ঋণের সুদ দেশটির প্রতিরক্ষা বাজেটের চেয়ে বেশি। মুদ্রাস্ফীতি যদি অব্যাহত থাকে, তবে খুব শীঘ্রই আমেরিকাকে মৌলিক চাহিদা মেটানোর লড়াইয়ে শামিল হতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ডলার হলো 'গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সি', অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে ডলার সঞ্চয়ের বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। বিশ্বব্যাপী রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারের অবস্থান বা এই মুদ্রাটির মূল্যমানের ওপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নির্ভরশীল। ডলারের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি, অর্থাৎ মূল্য পরিবর্তন বাণিজ্য ঘাটতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতির কারণে আমেরিকার আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি বিশেষ লক্ষণীয়।

ট্রাম্প প্রশাসনের খামখেয়ালি নেতৃত্বে উপেক্ষা করা হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বর্তমান বাস্তবতা। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ভবিষ্যৎ পরিণতি কী দাঁড়াবে সেই বিষয়েও উদাসীন ট্রাম্প প্রশাসন। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুল্ক আরোপকে একটি চটজলদি 'সমাধান' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলির পরিণামস্বরূপ আমেরিকায় দেখা দিতে পারে মুদ্রাস্ফীতি। এর ফলে বাড়তে পারে গ্লোবাল জিডিপি ও মার্কিন জিডিপি (আমেরিকার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন) হ্রাসের ঝুঁকি। শুল্কবৃদ্ধির ফলে আর্থিক বোঝা কেবল রপ্তানিকারক দেশ এবং মার্কিন ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরেই চাপবে না। শেষ পর্যন্ত মার্কিন নাগরিকদের ওপরেও আর্থিক চাপ বাড়বে যারা ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভারে জর্জরিত।

আমেরিকার প্রেক্ষাপটে, মার্কিন জনতার শ্বেতাঙ্গ অংশটির সামাজিক অবস্থান এই মুহূর্তে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে একদা আসীন এই লোকজন তাদের সেই অবস্থান থেকে প্রায় বিচ্যুত। এমতাবস্থায় অ-শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার প্রভূত সম্ভাবনা। অ-শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর এই রাজনৈতিক উত্থানের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'অভিবাসন' একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। আর্থিক বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হিসেবে একদা পরিগণিত হলেও নানা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে অভিবাসন রোধ করা মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার এবং সীমান্তরক্ষার প্রতি কড়া নজরদারিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। জাতিবিদ্বেষজনিত উত্তেজনা, প্রবল রাজনৈতিক মতপার্থক্য, স্বাস্থ্যপরিষেবার শোচনীয় পরিস্থিতি এবং ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্যের মতো জটিল পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলেছে বৃহৎ মার্কিন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশনগুলি। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এই কর্পোরেশনগুলি নানা ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত। আমেরিকা অন্য দেশের ওপর শুল্কের বোঝা চাপানোর ফলে প্রকারান্তরে তাদের এই শুল্কের বোঝার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। মার্কিন শুল্কনীতি তাদের মুনাফা হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকার যাবতীয় সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিগত কয়েক দশকের অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদ। আমেরিকায় অনেক রকম রাজনৈতিক বিতর্ক হলেও 'বর্জ্য'-এর বিষয়টির ওপরে এই দেশে কোনো আলোচনা হয় না। বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয় না আমেরিকা। প্রয়োজনীয় হলেও অনেক উৎপাদিত পণ্য অপচয় করে থাকে আমেরিকাবাসী। তাদের দ্বারা দরকারি হলেও ফেলে দেওয়া পণ্যের মোট পরিমাণ রীতিমতো বিস্ময়কর! এই ব্যাপক ও লাগামছাড়া ভোগবাদ পরিবেশের ক্ষতি, প্রাকৃতিক সম্পদহানি এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের কারণ হয়েছে। আমেরিকার জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশ হলেও তারা বিশ্বব্যাপী উত্তোলিত প্রাথমিক শক্তিসম্পদ বা গ্লোবাল প্রাইমারি এনার্জি (উদাহরণ— কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি)-র ১৬ শতাংশ ব্যবহার করে। তাদের এহেন কার্যকলাপ প্রকৃতি-পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি, বিশ্ব পরিবেশ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। উন্নয়ন ও আর্থিক বৃদ্ধিকেও যে সুষম, সুসংহত ও সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন— আমেরিকায় সেই সংক্রান্ত সামাজিক বিতর্ক, মতবিনিময় ও পর্যালোচনার নিতান্ত অভাব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্র। বিশ্বের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতাধর এই দেশটির সমকক্ষ কেউ হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস্ চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী রিজার্ভ মুদ্রার স্বীকৃতিলাভ করে 'ডলার'। এই সুবিধাজনক অবস্থানটির কারণে নানা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে লাভবান হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ডলারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে কাজে লাগায় আমেরিকা। পণ্য ও পরিষেবা আমদানির ক্ষেত্রে তাদের হাতে অর্থের কোনো অভাব ছিল না। এছাড়াও ভোগবাদের প্রভাব দেশটিকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমদানি-নির্ভর অর্থনীতি এবং ভোগবাদী মানসিকতা আমেরিকার অনিয়ন্ত্রিত আর্থিক সম্প্রসারণে সহায়ক হয়। এরপর বহু বছর ধরে, মার্কিন আধিপত্য বিশ্বজুড়ে আকর্ষণ করতে থাকে আর্থিক পুঁজি। আমেরিকার গতিশীল বাজার এবং সামরিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইন্ধন জোগায় এই পুঁজি। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমেরিকার ওপর কোনো শত্রুদেশের আক্রমণ সংঘটিত হয়নি। ফলে যুদ্ধের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল মার্কিন ভূখণ্ড। বিশ্ব অর্থনীতিতে 'ডলার ডমিন্যান্স' বা ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে বিশ্ব ঋণভারে জর্জরিত হলেও পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ উপভোগ করতে থাকে আমেরিকা। ইচ্ছেমতো ব্যয় করার মতো চূড়ান্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী হয় আমেরিকাবাসী। কিন্তু এই পর্যায়ের শেষে মার্কিন কর্পোরেট সংস্থাগুলির লোভ হয়ে ওঠে সীমাহীন। দেশীয় শিল্পে উৎপাদন ব্যয় বেশি। এই কারণে মার্কিন শিল্পাঞ্চলগুলি বন্ধ হতে শুরু করে। বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত কারখানাগুলি চীন-সহ বিভিন্ন দেশে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। সস্তা শ্রম এবং অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন ব্যয়ের কারণে মার্কিন শিল্পের একটা বড়ো অংশ হয় চীন-অভিমুখী। এই ব্যাপারগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা আরও বৃদ্ধি করে। ডলারের অবস্থান মার্কিন অর্থনীতির দুর্বলতাগুলিকে ঢেকে রাখলেও তার আড়ালে ধীরে ধীরে আমেরিকার নিজস্ব ঋণের বোঝা গুরুতর হয়ে ওঠে।

দেশীয় উৎপাদন শিল্প বন্ধ হতে থাকার দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি 'সার্ভিস-ওরিয়েন্টেড সোসাইটি' বা পরিষেবাক্ষেত্রভিত্তিক সমাজে পরিণত হয়েছে। কলকারখানা, কাঁচামাল, মেশিনারি বা যন্ত্রপাতির মতো ফিজিক্যাল রির্সোসেস বা ভৌত সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, সামগ্রী ও প্রক্রিয়াহীন হয়ে পড়েছে আমেরিকা। অধিকাংশ পণ্য ও পরিষেবার জন্য বিশ্বের বৃহত্তম এই অর্থনীতি বর্তমানে বাকি বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল। এই কারণে আমেরিকা আজ এক অস্বস্তিকর বাস্তবতার মুখোমুখি। ব্রিকসের মতো ভূ-রাজনৈতিক জোটগুলি আমেরিকার কাছে আর এক অশনি সংকেত যা হয়তো মার্কিন শাসকদের মনে কোনো অজানা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। আমেরিকার বাস্তব পরিস্থিতি তাই সত্যিই উদ্বেগজনক। আমেরিকার ভাগ্যাকাশে যখন নানা সংকটের মেঘ ঘনিয়ে উঠছে, তখন এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে ডেমোক্র্যাটদের ক্ষমতাচ্যুত করে আমেরিকান ভোটাররা। ডোনাল্ড ট্রাম্প উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবেন এই আশায় তাকে নির্বাচিত করে আমেরিকা। যদিও ক্ষমতায় ফিরে তিনি বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে 'ডিসরাপটর ইন চিফ' বা প্রধান বিঘ্নসৃষ্টিকারী হিসেবে পরিচিত হয়েছেন।

ট্রাম্পের ধারণা যে, তিনি তার পাওয়া জনাদেশের ভিত্তিতে কাজ করে চলেছেন। প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি লেন-দেনমূলক। বন্ধু হোক বা শত্রু— সকলের সঙ্গেই তাকে কৌতুকপূর্ণ আচার-আচরণ করতে দেখা যায়। গোটা বিশ্বকে শোষণ এবং সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে অতীত, ভবিষ্যৎ সবকিছুকেই উপেক্ষা করার নীতি নিয়ে চলে আমেরিকা। এর ফলে বিশ্ববাসী বুঝতে পেরেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সুযোগসন্ধানী দেশ যারা আন্তর্জাতিক আইন বা রীতিনীতির প্রতি গুরুত্ব দেয় না। আমেরিকার কাছে নিজস্বার্থ সর্বোপরি। আমেরিকা নিজ স্বার্থকে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে বিশ্ব এখন আমেরিকার সঙ্গে একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি। বিভিন্ন দেশ বন্ধু হিসেবে আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে আমেরিকার খামখেয়ালীপনার বিরোধিতা করতে যাওয়াও আরেকটি বড়ো সমস্যা। সেক্ষেত্রে সরাসরি আমেরিকার রোষানলে পড়তে হয়।

ট্রাম্পের বোঝার প্রয়োজন যে, বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে ভারত প্রস্তুত ও সক্ষম। বৈরীমনোভাবাপন্ন দেশগুলির সঙ্গেও শত্রুতা বৃদ্ধির পরিবর্তে ভারত শত্রুতা হ্রাসের নীতিই সবসময় অবলম্বন করে। তবে নতুন ভারত কোনো অন্যায় বা দাদাগিরি কিন্তু সহ্য করে না। ট্রাম্পের এখন যা মেজাজ-মর্জি, সেক্ষেত্রে ভারতকে যদি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে কল্পনা করা হয়, তবে রাবণরূপী ট্রাম্প তাঁকে (অর্থাৎ ভারতকে) অনেকটা দূরে ঠেলে দেবে, কিংবা আমেরিকা- ভারতের কূটনৈতিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে— এই চিত্র কল্পনা করা খুব একটা অবাস্তব নয়। ট্রাম্পের অ্যাজেন্ডার সদর্থক দিকটি হলো ভোগবাদী মানসিকতা হ্রাস করে স্থায়ী, স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বদান। এর বিপ্রতীপে ট্রাম্পের অ্যাজেন্ডার কিছু অদূরদর্শী ও নেতিবাচক দিকও রয়েছে, যার ফলে আমেরিকাকে বাদ দিয়ে বিশ্বকল্যাণের লক্ষ্যে সব সমস্যার সমাধান অন্বেষণে পরিচালিত হতে পারে গোটা বিশ্ব। কৌতুকের বিষয় হলো, ট্রাম্পের অ্যাজেন্ডার কারণে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য এবং আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্করক্ষাকারী দেশগুলি আর্থিক ক্ষতি এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হলেও এই প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাব কিন্তু স্বল্পমেয়াদী। এই দেশগুলির প্রতি মার্কিন নীতির ফল দীর্ঘমেয়াদে হয়তো লাভজনক হতে চলেছে। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক প্রভাবের বিষয়টি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে বিশ্বের বাকি দেশগুলির সম্পর্কও প্রতিনিয়ত পুনর্নির্মিত হচ্ছে। মার্কিন নীতি পরিবর্তনের কারণেই এই সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে। এটি এমন একটি নীতিগত পরিবর্তন, যা বজায় রাখার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছেন ট্রাম্প।

বস্তুতপক্ষে, আমেরিকা হলো একটি অত্যন্ত লোভী দেশ, যা আধুনিক কালের 'রাবণ' হিসেবে ক্রিয়াশীল। এখন প্রশ্ন হলো ভারত কি আমেরিকা নামক দশাননের অন্যতম একটি মস্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, নাকি বিভীষণ বা শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করবে? সম্ভবত, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইছেন শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকা পালন করুক ভারত।

(লেখক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর কালচারাল স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

ভারত-আমেরিকা দ্বৈরথ : সমস্যা সমাধানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় ডোনাল্ড ট্রাম্প আসার পর অনেকের ধারণা ছিল আমেরিকা-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু এখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা খারাপ দিকে যাচ্ছে। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, যেকোনো জাতীয়তাবাদী, রক্ষণশীল সরকার তাদের দেশের স্বার্থ আগে দেখে। ভারত যেমন তার কৃষক, গোপালক বা মৎস্যচাষিদের স্বার্থ দেখে, কিছুটা সেরকমই তাদের বৃহৎ কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষা করে মার্কিন প্রশাসন। তাছাড়া, ডলার হেজিমনির (অর্থাৎ একচ্ছত্র আধিপত্যের) ফলে এবং পরবর্তীকালে ডব্লুটিও চুক্তির ফলে মার্কিন পরিষেবা এবং পণ্য উৎপাদন এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে তাদের আমদানি বেশি ও রপ্তানি কম। এখন তারাই ডলার ছাপাচ্ছে, সেই ডলার দিয়ে তারাই পণ্য কিনছে— যার অর্থ দাঁড়ায় তারা বিনা পয়সায় অন্যের কষ্টে তৈরি জিনিসপত্র ভোগ করছে। তাহলে সমস্যা কোথায় ট্রাম্পের?

আসলে আমেরিকার মানুষের হাতে কাজ নেই। কিছু মানুষের আয় প্রচুর। আবার সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমেও সমাজের আরেকটা শ্রেণীকে প্রচুর ভাতা দেওয়া হয়। বহু পণ্য ও পরিষেবা নাগরিকদের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু কাল যদি ডলার হেজিমনি শেষ হয়ে যায়? জমিদারি চলে যাওয়া জমিদারের থেকেও তাদের খারাপ অবস্থা হবে। সবাই এসে তাদের সঞ্চিত ডলার জমা দিয়ে তার পরিবর্তে চাইবে সোনা। যার পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি-র তিন গুণ। তাই অর্থনীতিকে প্রতিনিয়ত সচল রাখতে প্রয়োজন হলো দেশীয় শিল্প ও কলকারখানা এবং তার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন। দেশীয় পুঁজিপতিদের বলা যে দেশেই কারখানা খোলো। অন্যান্য দেশগুলিকে বলা যে, আমাদের পণ্যের জন্য তোমাদের বাজার খোলো।

ভারতকে বলা হয়েছে, রাশিয়ার খনিজ তেল না কিনতে এবং আমেরিকার থেকেই কৃষিপণ্য, দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ ইত্যাদি কিনতে। এখন ভারতের সমস্যা কোথায়, আর আমেরিকারই-বা লাভ কোথায়?

প্রথমে আসি খনিজ তেলের বিষয়ে। রাশিয়ার তেল ভারত কিনছে টাকা ও রুবলে, যা আগে কেনা হতো ডলারে। প্রতি ডলার ভারত-রাশিয়ার ব্যবসায় দাম বাড়ত তৃতীয় পক্ষ মার্কিন ডলারের। বর্তমানে টাকা ও রুবলে ভারত-রাশিয়ার ব্যবসাবাণিজ্য চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তো ক্ষতি। তারা চায় ভারত তেল কিনুক ওপেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশ থেকে যেখানে বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে আমেরিকার। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রাম্পের কোম্পানি সেভরনও নাকি তেলের ব্যবসায় আগ্রহী। কিন্তু তাতে চাহিদা বাড়লে আন্তর্জাতিক বাজারে ওপেক বাড়িয়ে দেবে তেলের দাম। ভারত তার প্রয়োজনের ৮০ শতাংশ খনিজ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করে। কম দামে পাওয়া রাশিয়ান তেল ছেড়ে ভারত কেন ওপেক দেশগুলির থেকে বেশি দামে তেল কিনে মার্কিন ডলারের দাম আরও বাড়াতে সাহায্য করবে?

এবার আসা যাক কৃষিপণ্যের বিষয়ে। বলা বাহুল্য যে, কৃষিপ্রধান দেশ ভারতের পক্ষে অধিকাংশ মার্কিন কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেই বাজার খোলা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারত সরকার চাইলে একটি বিষয় ভেবে দেখতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত জেনেটিকালি মডিফায়েড সয়াবিনের বাজার খুলে কিছুটা দরদামের রাস্তায় চাইলে হাঁটতে পারে ভারত। বামপন্থীরা না বোঝে বিজ্ঞান, না বোঝে অর্থনীতি। তাদের কথা শুনে কেন একটা বড়ো আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা হবে না?

ভারত যে সয়াবিন তেল আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিল থেকে আমদানি করে সেটাও জেনেটিকালি মডিফায়েড সয়াবিন থেকেই তৈরি। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সয়াবিন থেকে তেল তৈরি করে না। ভারত যদি আমেরিকা থেকে সয়াবিন আমদানি করে তেল বানিয়ে দেশীয় বাজারে বিক্রি করে বা রপ্তানি করে তাহলে অসুবিধা কোথায়? এমন খাবার এই মুহূর্তে বাজারে নেই যেখানে আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলের তেল ব্যবহৃত হয় না। ভারতে কাঁচা সয়াবিন পশুপালন, পোল্ট্রি, ফিশারিতেও প্রাণীখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেকোনো সংকট নতুন রাস্তা খুলে দেয় মানুষকে। ভারতের উচিত কৃষিতে আরও বৈচিত্র্য আনা। ধান, গম চাষের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব আসার পর এদেশের খাদ্য নিরাপত্তা (ফুড সিকিউরিটি) নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু নিউট্রিশনাল সিকিউকিটি বা পুষ্টিজনিত নিরাপত্তা থেকে এখনও বঞ্চিত দেশের একটা বড়ো অংশ। তাই অবিলম্বে শ্রীঅন্ন বা মিলেট-সহ ডাল, সর্ষে এবং নানারকম ফল ও শাকসবজি চাষের ওপর গুরুত্বদান আবশ্যক। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে, বামপন্থীরা সবসময় আধুনিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতির বিপক্ষে। তাদের ভিত্তিহীন কথাবার্তা শুনে কেন পিছিয়ে আসবে ভারত সরকার? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত ৫০ শতাংশ শুল্ক যদি ভারত দরদাম করে না কমায়, বা অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি অবলম্বন না করে, কিছু দেশীয় শিল্প তো ক্ষতির সম্মুখীন হবে! □

নির্বাচন কমিশনের সদর্থক ভূমিকা ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

শ্রী জ্ঞানেশ কুমার ভারতের ২৬তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিরোধী রাজনীতিকরা তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে সরব হয়েছেন— বিশেষ করে নভেম্বর ২০২৪-এ মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে কারচুপি করে বিজেপি জোট ক্ষমতায় এসেছে— এমন অভিযোগে বিদ্ধ নির্বাচন কমিশন। যদিও নভেম্বর ২০২৪-এ জ্ঞানেশ কুমার নির্বাচন কমিশনে যোগদানই করেননি, তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে কাজে যোগ দেন। বিরোধীরা কোনো নির্বাচনে কোথাও জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেই তাদের কোপে পড়ে নির্বাচন কমিশন। আবার পঞ্জাব, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালায় জিতলে, তখন জনতা- জনার্দনের রায়ে তারা আপ্লুত হন— নির্বাচন কমিশন বা নিষ্প্রাণ ভোটিং মেশিনের বিরুদ্ধে রা কাড়েন না। এধরনের অভিযোগ মূলত শোনা যায় প্রধান বিরোধী দলের দাপুটে নেতা— রাহুল গান্ধীর মুখে এবং তাঁকে আমল দিতে না চাওয়া নেত্রী মমতা ব্যানার্জির মুখে— এরা কথায় কথায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারেন, অথচ একটি অভিযোগও প্রমাণের দায় নেন না। যেহেতু, নির্বাচন কমিশনের মতো একটি স্বাধীন সংবিধানিক সংস্থার পক্ষে বিতর্কে নামা এবং প্রতিটি কুৎসার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ তাদের মর্যাদার পরিপূরক নয় বলেই বেপরোয়া রাজনীতিকদের অভিযোগ সীমাহীন।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র-এ বিষয়ে আমাদের শ্লাঘার শেষ নেই— কথায় কথায় সর্বজনগ্রাহ্য গণতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের উদ্ধৃত দিয়ে থাকেন অনেকে— ‘Democracy is a Government of the people, by the people and for the people.’ এই সংজ্ঞাটির সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অংশটি হচ্ছে ‘By the people’ অথচ যারা নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর অংশগ্রহণ এবং তাদের মতামত প্রতিফলনে বাধাদানে নিয়ত প্রয়াসী, তারাই গণতন্ত্রের বুলি বেশি আওড়ান। গণতন্ত্রের আকার-আয়তন দিয়ে উৎকর্ষ মাপা যায় না। প্রত্যেক নাগরিকের অবাধ এবং নিরপেক্ষ অংশগ্রহণ নিয়ে গণতন্ত্রের সফলতা প্রমাণিত হয়। দেখা যাক এর প্রতিফলন ভারতীয় নির্বাচনে কীভাবে ঘটছে।

প্রবীণদের অনেকেই মনে করতে পারবেন টিএন শেষন নামক ভারতের নির্বাচন কমিশনারের নাম--- তিনি ভারতে সচিত্র পরিচয়পত্রের সূচনা করেন। তখনও কিন্তু আজকের SIR (Special Intensive Revision) এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মতোই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা (জ্যোতিবাবুর সরকার) কমিশনার শেষন সাহেবের বিরুদ্ধে (১৯৯০-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে) অকথ্য গালিগালাজ করতেন, যেমনটি করছেন বর্তমানের লালু-ভুলুরা— বক্তব্য ছিল ভারতবর্ষের মতো দেশে সচিত্র পরিচয়পত্র করিয়ে ভোট করা সম্ভব নয়, এ কাজে এগোলে কোটি কোটি প্রকৃত ভোটার বাদ পড়বে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোট পর্ব ব্যাহত হবে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু টিএন শেষন সাহেবকে উন্মাদ বলে অভিহিত করলেও জ্যোতিবাবুরা তটস্থ থাকতেন পরের নির্বাচন পর্যন্ত শেষন ক্ষমতায় থাকলে বৈজ্ঞানিক রিগিং বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ভয়ে। কারণ তখন বিচার বিভাগের অতি সক্রিয়তা ছিল না, প্রত্যেকটি সাংবিধানিক সংস্থা নিজের এক্তিয়ার সম্পর্কে সতর্ক এবং অন্যের অধিকারে অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকত, যাতে কোনো সাংবিধানিক সংকট তৈরি না হয়। শেষন জানতেন তিনি একটি সাংবিধানিক পদে আছেন এবং একমাত্র ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে, তথা সংবিধানের কাজ দায়বদ্ধ। তাই তিনি সরবে ঘোষণা করেছিলেন— ‘I am the Election Commissioner of India— not Government of India.’ শেষন সাহেব নির্বাচন কমিশনকে এক মর্যাদার অবস্থানে উন্নতি করেছেন। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারও যদি সংবিধান এবং কমিশনের নিরপেক্ষতা ও মর্যাদা রক্ষা করে ভোটার লিস্ট সংশোধন কঠোরতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারেন কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে, তার পূর্বসূরী টিএন শেষন-এর মতো শিরদাঁড়া সোজা রাখতে পারেন, তাহলে ভারতীয় গণতন্ত্র সফল হতে পারবে।

এই সফলতা শুধুমাত্র ভোটার লিস্ট পরিমার্জনের মাধ্যমেই হবে না— তবে নিঃসন্দেহ এটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। যে

> **অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেশ দেবে কিনা তা সরকার বা দেশের মানুষ ঠিক করবেন, তবে এরা যাতে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত বা প্রভাবিত করতে না পারে সে ব্যাপারে এসআইআর একটি বড়ো পদক্ষেপ।**

ফঃ ২

কোনো রাজ্যে লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের অস্তিত্ব নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করবে নিঃসন্দেহে। কয়েক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি দল সমূহ ভোটার লিস্টে নাম থাকা মৃত ভোটার, দেশত্যাগী বা রাজ্যত্যাগী ভোটার, একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটারদের প্রক্সি ভোটের নিপুণ ব্যবহার করে থাকে। একথা দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী এজেন্ট শূন্য বুথে বা বিরোধী এজেন্টদের মারধর করে বের করে দিয়ে ভোটার লিস্টে নাম থাকা প্রতিটি ভোটের সদ্ব্যবহার করে। ভোটের আগের দিন থেকে সরকারি দলের কর্তারা পুলিশকর্মী, নির্বাচন-কর্মীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা দেখভাল করেন— সেই দাপুটে নেতারা নির্বাচনের দিন বেশ কয়েক ঘণ্টা পার হওয়ার পরে সদলবলে লিস্ট দেখে ভোটগুলি কাস্ট করালে কার সাধ্য তাদের বাধা দেয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বুথে প্রবেশের অধিকার নেই, ক্যামেরা কাজ করে না, বিরোধী এজেন্ট শূন্য বুথে সরকারি দল ছাপ্পা মারলে তার রুখে দেওয়ার সাহস এবং সদিচ্ছা ভোট কর্মীদের থাকার কথা নয়। তাছাড়া sleeping ভোটারদের ভোট নিয়ে হইচই হয় না, কারণ তাদের উপস্থিতি নেই। কোনো প্রকৃত ভোটার ভোট দিতে না পারলে এবং প্রতিবাদ করার সাহস থাকলে চিৎকার চেঁচামেচি হয়তো হয়, ভুতুড়ে ভোটারদের ক্ষেত্রে সবকিছু সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুতরাং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিক ভোটার লিস্ট তৈরি, যাতে কোনো প্রকৃত ভারতীয় ভোটার বাদ না পড়ে এবং কোনো অনাগরিক বা অবৈধ ব্যক্তির নাম ভোটার লিস্টে না থাকে।

শুদ্ধ ভোটার লিস্টে নাম থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করাও অন্যতম কর্তব্য নির্বাচন কমিশনের। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকার বিরোধী ভোটারদের বাড়ি থেকে না বেরোনোর হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে প্রায়শই সেখানে ভোটের আগে ও পরে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকলে, অনেক ভোটার সাহস করে বাড়ির বাইরে বুথমুখী হবেন না। সেক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তা দানের ভূমিকা অতীতে সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং ভোটের আগে-পরে প্রচুর মানুষের প্রাণহানি হওয়ার, সাধারণ মানুষ বুথমুখী হওয়ায় সংশয়ান্বিত, তাহলে কীভাবে অবাধ নির্বাচন সম্ভব? বিরোধীদের দাবি মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করলেই চলবে না, তার প্রয়োগ যথাযথ না হলে কমিশনের প্রতি মানুষ আস্থা হারাবেন।

তৃতীয়ত, ভোটের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো পদাধিকারীকে পক্ষপাতদুষ্টতার জন্য দায়িত্বে অব্যাহতি দেওয়া হলেও, ভোট পরবর্তীকালে তার পদোন্নতি হয়, এমনকী পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। এধরনের নির্বিষ শাস্তিতে কাজের কাজ কিছু হয় না, যদি না তা পরবর্তীতে পদোন্নতির অন্তরায় না হয়। অবাধ নির্বাচনের প্রয়োজনে কমিশনকে আরও বেশি কঠোর হতে হবে, প্রয়োজনে বিধি বদলাতে হবে। এছাড়াও ভোট গণনায় প্রত্যেক প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্ট উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন করার সময় ভোটার তালিকাগুলির মধ্যে ২০০৩ সালের তালিকাকে ভিত্তি হিসেবে ধরলে বঞ্চিত হবে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি হিন্দু যারা ২০১৪-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে এসেছেন--- যাদের ২০১৯ সালের সংশোধিত নাগরিক আইনে ইতিমধ্যেই De facto নাগরিক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ এখনো প্রথাগত নাগরিক কার্ড বা Formal Citizenship Certificate এখনো নেননি, কিন্তু তাদের কাছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড রয়েছে। যদি দেখা যায় ওই সমস্ত দলিল, কার্ড ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে যেন তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয়, বিএলও-দের প্রশিক্ষণকালে এধরনের নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।

জাতির সামনে বর্তমানে একটি গভীর সংকট এসে উপস্থিত হয়েছে। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের প্রভাবে শুধুমাত্র সীমান্ত রাজ্যগুলিই নয়, ভারতের সবকটি মেট্রো শহরে বাংলাদেশি বে-আইনি অনুপ্রবেশকারী এবং বাংলাদেশ হয়ে ভারতে আসা লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গারা শুধু জন-ভারসাম্য পালটে দিচ্ছে তা নয়--- আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা, এমনকী দেশের অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেশ দেবে কিনা তা সরকার বা দেশের মানুষ ঠিক করবেন, তবে এরা যাতে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত বা প্রভাবিত করতে না পারে সে ব্যাপারে এসআইআর একটি বড়ো পদক্ষেপ। নির্বাচন কমিশন কোনো হুমকি বা প্রতিবাদে প্রভাবিত না হয়ে নিজেদের কর্তব্যে স্থির থাকবেন এটাই প্রত্যাশা, অন্যথায় গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হবে। আর বাংলাদেশের অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্ত রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার ভারসাম্য পালটে যাচ্ছে অর্থাৎ Demographic imbalance-এর জন্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তা কীভাবে সামলানো যাবে, তা নিয়ে সরকার এবং রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলগুলি আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আমরা যেন ফরাসী দার্শনিক Auguste Comte-র সতর্ক বাণী ভুলে না যাই— 'Demography is destiny' অর্থাৎ জনবিন্যাসই একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

With Best Compliments From -

A
Well Wisher

ভারতের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধ
আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব

বিমলশঙ্কর নন্দ

ইচ্ছে করেই শিরোনামে আমেরিকা না লিখে ট্রাম্প লেখা হয়েছে। এটা ঠিক যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেজন্য তাঁকে আমেরিকার পার্লামেন্ট ইউএস কংগ্রেসের কাছে তেমন একটা জবাবদিহি করতে হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যেহেতু কংগ্রেসের কোনো কক্ষের সদস্য থাকতে পারেন না তাই কংগ্রেস সদস্যরা তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন না। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন না। তাই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অনেক স্বাধীনতা ভোগ করেন। আর আমেরিকার মতো দেশে যেখানে জাতীয় স্বার্থ সবার আগে সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' স্লোগান তুলে নিজের মতোই সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করেছেন। আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশ সচিব ড. হেনরী কিসিঞ্জার একবার বলেই দিয়েছিলেন--- 'আমেরিকার কোনো বিদেশনীতি নেই'। তাই ভারত-সহ আরও বহু দেশের উৎপাদিত পণ্যের উপর ডোনাল্ড ট্রাম্প যে শুল্ক আরোপ চলেছেন তা আমেরিকা অনুসৃত দীর্ঘমেয়াদী কোনো নীতির ফল নয়। তা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অনুসৃত নীতি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেজাজের মতো এই নীতিও পরিবর্তনশীল। তাই একে নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ারও কোনো কারণ নেই।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আছে World Trade Organisation (WTO) বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। ১৯৯৪ সালে মারাকেশ সমঝোতার ফলশ্রুতি হিসেবে ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ সালে গড়ে ওঠে এই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)-এর স্থলাভিষিক্ত হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। এই বিশ্ব সংস্থাটির প্রধান কাজই হলো বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনার একটি ফ্রেমওয়ার্ক বা পরিকাঠামো তৈরি করা এবং এর সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্য বিরোধের মীমাংসা করা। কিন্তু ১৬৬ সদস্য বিশিষ্ট এই সংস্থাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প গুরুত্বই দেন না। তাঁর দেশের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তিনি সব আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে বেরিয়ে আসার হুমকি দেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানেন তাঁর দেশের নমিনাল জিডিপি এই বছরের ২০২৫ সালের হিসেবে ৩০.৫০৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তা বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। এই দেশ বিশ্ব অর্থনীতির মূল প্রক্রিয়ার বাইরে চলে গেলে বিশ্ব অর্থনীতিতেই বিপর্যয় নেমে আসবে। তাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো প্রেসিডেন্ট মনের সুখে বিভিন্ন দেশকে ব্ল্যাকমেইলিং করে যান। ফলে অর্থনীতিতে সাময়িক ঝড় ওঠে কিন্তু পরে তা আবার (২০২৫ সালের) পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকলেও বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ নতুন নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্র পরিচালনা করেন 'বিজনেস' করার ঢঙে। সেখানে অর্থনৈতিক লাভক্ষতি তাঁর কাছে রাজনৈতিক লাভক্ষতির চেয়ে সবসময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর আগের মেয়াদে ট্রাম্প যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন (২০১৭-২১), তখনও বাণিজ্য নিয়ে দু'দেশের বিরোধ ছিল। ট্রাম্প সেই সময়ও অভিযোগ করেছিলেন যে ভারত আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যের ওপর ১২ শতাংশ শুল্ক চাপায় যেখানে আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ধার্য করে মাত্র ২.২ শতাংশ। এই কারণে ট্রাম্প প্রশাসন ২০১৯ সালে ভারতকে দেওয়া Generalised System Preferences (GSP) মর্যাদা প্রত্যাহার করে

নিয়েছিল। GSP হলো এক ধরনের অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক ব্যবস্থা (preferential tariff system) যা আমেরিকার মতো উন্নত দেশ কোনো উন্নতিশীল দেশের আর্থিক প্রগতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সেই দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর খুব কম আমদানি শুল্ক চাপায় বা আমদানি শুল্ক পুরোপুরি ছাড় দেয়। ভারতকে দেওয়া এই অগ্রাধিকারমূলক মর্যাদা (preferential status) আমেরিকা প্রত্যাহার করার ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর কিছুটা প্রভাব পড়ে আর তার পালটা হিসেবে ভারতও আমেরিকা থেকে আমদানি করা বাদাম, ইস্পাত-সহ বেশ কিছু দ্রব্যের ওপর আমদানি শুল্ক চাপায়। এই বিরোধ সত্ত্বেও ২০২০ সালে একটি ছোটো আকারের বাণিজ্য চুক্তি করার পথে দুটি দেশই এগিয়ে ছিল অনেকখানি, কারণ ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ট্রাম্প বুঝতে পেরেছিলেন। ২০১৯ সালেই এই বাণিজ্য ১১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছুঁয়েছিল। কিন্তু ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প হেরে যাওয়ার পর এই চুক্তি আর হয়নি। জো বাইডেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আমেরিকা ভারতের প্রতি বেশ কিছুটা সহযোগিতামূলক বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করে। এখন আবার বিরোধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ভারতের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকলেও বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ কখনোই সেভাবে মিটে যায়নি।

যারা ভারতীয় পণ্যের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপকে ভারতের বিদেশনীতির ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা এই খবরটা লুকিয়ে যান যে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় এসে শুল্ক আরোপকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতি এবং বিদেশ নীতির অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত করেছেন। আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বিদেশ নীতি এবং বাণিজ্য নীতির তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন কিছু দেশের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করেছেন যারা আমেরিকার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দেশ। অনেক ক্ষেত্রে ওই দেশ তার নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ভাবে আমেরিকার ওপর নির্ভর করে। এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হলো ইজরায়েল। ২০২৫-এর ২ এপ্রিল ট্রাম্প ইজরায়েলের পণ্যের ওপর ১৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে দেন। ৮ এপ্রিল ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন এবং শুল্ক-সহ বিভিন্ন বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। কিন্তু তার পরও ট্রাম্প ইজরায়েলের পণ্যের ওপর থেকে অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করেননি।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ট্রাম্প কানাডা এবং মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। বাণিজ্যিক কারণ ছাড়াও তাঁর অভিযোগ ছিল এই দুই দেশ থেকে আমেরিকায় বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং ড্রাগ পাচার চলছে। দুটি দেশ আমেরিকার সরকারের সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে গেলেও শুল্ক প্রত্যাহৃত হয়নি। আমেরিকার বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ৩ মার্চ, ২০২৫ সংখ্যায় এ বিষয়ে মন্তব্য করেছে যে 'কানাডা এবং মেক্সিকো আমেরিকার শুধু প্রতিবেশীই নয়, দুটি বড়ো বাণিজ্য সহযোগী দেশ। তাদের সঙ্গে আমেরিকার ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টও আছে। আর ট্রাম্প যেভাবে কোনোরকম বিচার বিবেচনা না করে এই দুটি দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করে চলেছেন তাতে এই দুটি দেশের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

ইতিমধ্যেই এই দুটি দেশ আমেরিকার পণ্যের ওপর পালটা শুল্ক আরোপ করে দিয়েছে। আরও যে দুটি দেশ তাদের নিরাপত্তার জন্য অনেকটাই আমেরিকার ওপর নির্ভর করে, যারাও ট্রাম্পের শুল্ক জেহাদের শিকার হয়েছে তারা হলো তাইওয়ান এবং জাপান। গত ২ এপ্রিল ট্রাম্প সেমিকন্ডাক্টার পণ্য বাদ দিয়ে বাকি সব তাইওয়ানীয় পণ্যের ওপর ৩২ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। আর এ নিয়ে তাইওয়ানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তীব্র টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাম্প জাপানের গাড়ি এবং গাড়ির যন্ত্রাংশের ওপর ২৫ শতাংশ এবং অন্যান্য পণ্যের ওপর ২৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর জাপানের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যেহেতু জাপানের অর্থনীতি মূলত একটি রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি তাই ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত জাপানকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বহু আলোচনার পর ট্রাম্প জাপানের পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করেছেন। বিনিময়ে জাপানকে আমেরিকার কৃষি পণ্যের জন্য তার বাজার খুলে দিতে হয়েছে। ভারত বা চীন তাদের প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার মুখাপেক্ষী নয়। ভারত রাজনৈতিকভাবে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ হলেও চীনের উত্থান এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিদ চীনের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সম্পর্ককে সীমিত ঠাণ্ডা যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করছেন। চীনের পণ্যের ওপর ট্রাম্প প্রাথমিকভাবে প্রায় ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন। পালটা চীনও আমেরিকার পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল। অনেক আলোচনার পর আমেরিকা এবং চীন এই শুল্ক যথাক্রমে ৩০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশতে নামিয়ে আনে। দুই দেশ এখনো আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ট্রাম্পের এই শুল্ক যুদ্ধ থেকে আমেরিকার বন্ধু থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দেশই রেহাই পায়নি।

ভারতীয় পণ্যের ওপর ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত দু'দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলেছে ঠিকই কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হলো ভারতের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সহযোগী। ২০২১-২২ থেকেই চীনকে সরিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হলো ভারতের বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার দেশে পরিণত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের রপ্তানি ছিল ৮৬.৫১ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৭৭.৫২ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বাণিজ্য

বৃদ্ধির হার ছিল ১১.৬ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে আমদানি ছিল ৪৫.৩৩ বিলিয়ন ডলার যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৪২.২ বিলিয়ন ডলার। বৃদ্ধির হার ৭.৪৪ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে ১৩১.৮৪ বিলিয়ন ডলার। আর এই বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত থাকে ৪১.১৮ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভারতের পক্ষে উদ্বৃত্ত ছিল ৩৫.৩২ বিলিয়ন ডলার। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে চীন ছিল ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার।

চীনের আগে সংযুক্ত আরব আমির শাহী ছিল ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। ২০২১-২২ সাল থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চীনকে সরিয়ে ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদারে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ + অতিরিক্ত ২৫ অর্থাৎ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ভারত-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে ধৈর্য এবং সাবধানতার সঙ্গে। ভারত ঠিক সেই কাজটাই করছে। আবেগ বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনোরূপ চরম সিদ্ধান্ত নিলে তা জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করবে দীর্ঘস্থায়ীভাবে। ভারত-আমেরিকা সাম্প্রতিক শুল্ক সমস্যা সম্পর্কে এক অপরিপক্ক নেতার নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং বেশ কিছু বিরোধী দল যে সুরে ভারত সরকারের বিশেষত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে, কিংবা বলা ভালো বিদ্বেষমূলক প্রচার চালাচ্ছে তাতে সন্দেহ হয় এরা কি চাইছে যে ভারত এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়ে নিক যাতে দু'দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে আর ভারতের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়! এতে আমেরিকার ডিপ স্টেট খুশি হবে সন্দেহ নেই। ভারতে কিছু লোকও কি তাতে খুশি হবে? রাজনৈতিক ক্ষমতা এ দেশের কিছু মানুষের কাছে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যারা ভারতীয় পণ্যের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপকে ভারতের বিদেশনীতির ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা এই খবরটা লুকিয়ে যান যে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় এসে শুল্ক আরোপকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতি এবং বিদেশ নীতির অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত এর আগেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্কিত বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয়েছে এবং সাহসের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জারি করা সেই আর্থিক অবরোধের মোকাবিলাও করেছে। ১৯৯৮ সালের মে মাসে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে পরমাণু শক্তি পরীক্ষা করার এক সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারত সরকার। ১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে প্রথম পরমাণু পরীক্ষা চালানোর পর সেই পোখরানেই এটি ছিল দ্বিতীয় পরমাণু পরীক্ষা, যে কারণে একে 'পোখরান টু' বলা হয়। এর কোড নাম ছিল 'অপারেশন শক্তি'। এটি ছিল পরমাণু ক্ষমতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে ভারতের একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কারণ এর দু'বছর আগে ১৯৯৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা সার্বিক পরমাণু পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তির (কম্প্রিহেনসিভ নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান ট্রিটি বা সিটিবিটি) প্রস্তাব পাশ করে যার প্রধান লক্ষ্য ছিল পরমাণু পরীক্ষা সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ করা। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিল পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত এই চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ এই চুক্তি ছিল নিতান্তই একপেশে এবং পরমাণু শক্তিধর দেশগুলির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। পরমাণু পরীক্ষা করলে সিটিবিটি অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা বিধি আরোপিত হতে পারে এই ঝুঁকি নিয়েও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী পরমাণু শক্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভারত এই পরমাণু পরীক্ষা করার পরই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য কয়েকটি পশ্চিমি দেশ ভারতের ওপর অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ১৯৯৪ সালের 'আর্মস এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট'-এর গ্লেন অ্যামেন্ডমেন্ট (Glenn Amendment) অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যেমন মানবিক সহায়তা বাদ দিয়ে সমস্ত ধরনের বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া, সমস্ত ধরনের যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি বন্ধ করা, সমস্ত ধরনের সামরিক সহায়তা বন্ধ করা, আমেরিকার সরকারি এজেন্সিগুলি দ্বারা ঋণ বা ঋণের গ্যারান্টি দেওয়া বন্ধ করা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারতকে যেকোনো ধরনের ঋণ দেওয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করা, আমেরিকার ব্যাংকগুলোকে ভারতকে ঋণ প্রদান না করতে নির্দেশ দেওয়া, সামরিক কিংবা অসামরিক পরমাণু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে এমন দ্রব্য এবং প্রযুক্তির রপ্তানি নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি। বোঝাই যাচ্ছে 'পোখরান টু'-এর পর ভারতকে নিয়ন্ত্রণে আনতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও কিছু পশ্চিমি দেশ কী মারাত্মক সব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। অন্য যেকোনো দেশ হলে এই নিষেধাজ্ঞার সামনে নতজানু হয়ে যেত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে মাথা উঁচু করে এই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেইলিং -এর মোকাবিলা করে ভারত। এবং অন্তিমে জিত হয়েছিল ভারতেরই।

নবান্ন অভিযানের জবাবে : ৭ জানুয়ারি বনাম ৯ আগস্ট

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

ঘটনা নদীয়ার শান্তিপুরের। শাসকদলের ক্যাডারদের দ্বারা ধর্ষিতা হলো একটি মেয়ে। সেই পরিবারটি শাসক দলেরই সমর্থক। মেয়েটি মূক ও বধির। শাসক দেখালো ক্ষমতার লাম্পট্য। শাসক পুরুষের চোখে নারীর অস্তিত্ব কেবল তার মাংসে। মূক-বধির রেহাই পাবে কোন যুক্তিতে? পুলিশের সহযোগিতায় ধামাচাপা পড়ে গেল ঘটনাটা। হলো না কোনো এফআইআর। শাসক দল ঠিক যে কায়দায় ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা চালায় বার বার। চার মাসের মাথায় বিষয়টি এলো সংবাদে। ধর্ষিতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযো করলেন রাজ্যের প্রধান বিরোধী নেত্রী। কথা বললেন মায়ের সঙ্গে। ধর্ষণের কারণে মেয়েটি তখন অন্তঃসত্ত্বা।

বিরোধী সেই নেত্রী অবশ্যই রাজনৈতিক দলের সদস্যা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিবৃতা। ধর্ষিতা ও তার মাকে নিয়ে সটান পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষের সামনে। কোনো রাজপথ নয়। খোলা কোনো রাস্তা নয়। একেবারে মহাকরণে। সরাসরি রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবনে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কক্ষে নেই জেনেও লাগাতার গেট ক্রস করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। মহাকরণের ঠিক বাইরে তখন দলের ঝাণ্ডা হাতে কয়েকশো কর্মী-সমর্থক। এর কিছুদিন আগে সেই নেত্রী বেহালা থানার ওসিকে বের করে দিয়ে তার চেয়ারে জোর করে বসে এসেছেন। তবে এক্ষেত্রে পুলিশমন্ত্রীও বিষয়টি রেয়াত করেননি। এলো কড়া নির্দেশ। অতি সক্রিয় হয়ে উঠলো পুলিশ। এরপর চুলের মুঠি ধরে মহাকরণ থেকে বের করে দেওয়া হলো। তোলা হলো কালো একটা গাড়িতে।

সে গাড়ি ছুটলো লালবাজারে। জেলবন্দি হওয়ার আশঙ্কায় তখন হাত-পা ছুঁড়ছেন নেত্রী। সঙ্গে কলকাতার প্রায় সব সাংবাদিক। গভীর রাতে তাঁকে ছেড়ে দেয় লালবাজার পুলিশ। খানিকটা গলা ধাক্কা দিয়ে। ততক্ষণে তাঁর অনুগামীরা ৭২টি সরকারি এবং ৭৬টি বেসরকারি গাড়ি ভেঙে ফেলেছে। অসংখ্য জায়গায় অগ্নিসংযোগ করেছে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে ব্যাপক পরিমাণে।

এই ঘটনা ১৯৯৩ সালের ৭ জানুয়ারির। তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এই নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। যার নির্দেশে পুলিশ এমন আচরণ করেছিল, তিনি পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেদিনের এই ঘটনা কি অরাজনৈতিক ছিল? একেবারেই ছিল না। বরং নির্যাতিতার মা ও স্বয়ং নির্যাতিতাকে সঙ্গে করে ঘুরছিল রাজনীতি। মমতা ব্যানার্জি। পুলিশের পারমিশন তো দূরের কথা, এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কোনোভাবে অবগত পর্যন্ত করা হয়নি। তবে সেদিনের প্রশাসনিক প্রধান কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাননি। ৩১ বছর পর অভয়ার বিচারের দাবিতে নবান্ন অভিযানের সময় সেদিনের নেত্রী আর আজকের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছেন। একি কেবলই ভয়? নাকি আয়নায় নিজের কদর্য মুখখানা দেখে ফেলার আতঙ্ক?

১৯৯৩ সালে মহাকরণ অভিযানের বিষয়টি পুলিশকে জানানোর কথা ভাবনাতেই আনেননি যুব কংগ্রেসের সেই নেত্রী। পারমিশান অনেক পরের কথা। হাইকোর্ট, সিঙ্গল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্নই আসে না। অথচ আজকে তাঁর সরকারই প্রশ্ন তুলছে আন্দোলনের পারমিশান ছিল কিনা! আপাদমস্তক নির্লজ্জ না হলে এ প্রশ্ন কেউ করতে পারে?

প্রশ্ন উঠেছে রাজনীতির সংযোগ কেন? কেন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। যদিও এই আন্দোলন দলীয় পতাকা বিহীন। আন্দোলন দেশের জাতীয় পাতাকা হাতে নিয়ে। নির্যাতিতার বাবা-মা'র ডাকে 'নবান্ন অভিযান'। শাসক যদি ধর্ষকদের আড়াল করতে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অস্ত্র করে, তবে শাস্তির দাবিটাও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই হওয়া উচিত। তৃণমূলের বিজ্ঞের ধাড়িদের অনুরোধ ইতিহাসটা পড়ে দেখবেন।

প্রশ্ন ধর্ষিতা, বিচারহীনার পরিবার রাস্তায় কেন? তাতে নাকি পুলিশ উদ্দীপিত হয়ে পড়ছে! একথা শুনে ঘোড়াও হাসবে। খোলা আকাশের নীচে রাজপথে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ধর্ষণে মদত দাতা সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা হয়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তৈরি করেছে। ভয় সেখানে। মিছিলের অগ্রমুখ তাঁরা। ৩১ বছর পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জির সে কথা আজ আর স্মরণে আসেনি। আসার কথাও নয়।

বামফ্রন্টের কথা ছেড়ে দিলাম। কমিউনিস্টরা অরাজনৈতিক হতে শুরু করলেন কবে থেকে? তাদের শাসনকালে রাজ্য সরকারের মদতে ধর্ষণ-খুন ও তার প্রমাণ লোপাট দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হওয়ার পরও তাঁরা অরাজনৈতিক? আসলে তাদের রাজনীতি না করার নাটক, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার নগ্ন প্রকাশ। মহাকরণে থাকা প্রেস কর্নার ভেঙে দেওয়া পুলিশ, মমতা ব্যানার্জিকে আক্রমণ করা পুলিশ সেদিন অন্তত ধর্ষিতার পরিবারকে আক্রমণ করেনি। দেশের জাতীয় পতাকে পদদলিত করেনি।

২০২৪ সালের ৯ আগস্ট। নিজের কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণ হলো একটি মেয়ের। সে মূক-বধির নয়। ডাক্তারি পড়ুয়া। নৃশংসভাবে সে খুন হলো। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল নয়, রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল। সেটা শান্তিপুরের মতো প্রত্যন্ত কোনো গ্রাম নয়। রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত স্বাস্থ্য ক্ষেত্র। সেখানেও অতি যত্নে সব প্রমাণ লোপাট করা হলো। সক্রিয় সহযোগী স্বাস্থ্য দপ্তর। পুরো বিষয়টি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করলো রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ। ভেঙে ফেলা হলো অপরাধ স্থল। তারপরও কোনো এফআইআর করেনি প্রশাসন। আর কাকতালীয়ভাবে এই ঘটনাটি ঘটলো স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একই ব্যক্তির হাত ধরে। তিনি এ রাজ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া কন্যা, মানে 'অগ্নিকন্যা'।

সন্তান হারানোর হাহাকারে ক্রমশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে অভয়ার বাবা-মায়ের জীবন। সে যন্ত্রণা যতটা না সন্তান হারানোর, তার চেয়ে বেশি রাজ্য সরকারের নির্দয়তায়। তার অমানবিকতায়। গোটা রাজ্যের বাকি মানুষের মতো ধর্ষিতার বাবা-মা অস্থির হয়ে উঠেছেন অপরাধীদের আড়াল করার সরকারি নির্লজ্জতায়। বাধ্য হয়ে দাবি করেছিলেন সিবিআই তদন্ত। যদিও শেষ পর্যন্ত রাজ্য পুলিশ, সিবিআই, আদালত কেউই বিচার দিতে পারেনি নির্যাতিতার বাবা-মাকে।

আজও বিচারের আশায় তাঁরা বুক বাঁধছেন। ঘুরছেন সবার দ্বারে দ্বারে। তাঁরা বুঝেছেন অপরাধীদের আড়াল, প্রমাণ লোপাট সবকিছুই ঘটেছে পরিকল্পিতভাবে। রাজ্য প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায়। তাই তাঁরা ডাক দিয়েছিলেন 'নবান্ন অভিযান'-এর স্লোগান ছিল— 'দফা এক দাবি এক...'। বিচারের দাবিতে পথ হাঁটা হতভাগা মায়ের জুটলো পুলিশি নির্যাতন। ভাঙলো হিন্দু নারীর হাতের শাখা-পলা। ফাটলো মাথা। এরপরও যারা ইনিয়ে-বিনিয়ে এই অমানবিকতার সমর্থক, তারা আমাদের সহ নাগরিক হতে পারেন না।

কোথাও ধর্ষক শেষ কথা বলেনি। ধর্ষক-খুনিদের আড়াল করা শাসক অমর হতে পারে না। কালের চাকা ঘোরে। মানুষের প্রতিবাদে চিৎকারে ভূলুণ্ঠিত হয় রাজার দম্ভ। ধ্বংস হয় রাজ সাম্রাজ্য। অভয়ার চোখের জল নয়, ঝরে যাওয়া চোখের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত 'মৃত্যু পরোয়ানা' পাঠিয়েছে শাসককে। □

বাঙ্গালি ও বাং-আলির সন্ধি হলো কাঁঠালের আমসত্ত্ব

অরিন্দম ভট্টাচার্য্য

আমাদের বন্ধু, ভাই-বোন, ছাত্র-ছাত্রী, দাদা, দিদি ভারতের বিভিন্ন শহরে কর্মরত। পুনে, দিল্লি, গুরগাঁও, নয়ডা, ব্যাঙ্গালোর, ভাগ্যনগর, মুম্বই, আমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কোচি, চেন্নাই, ভেলোর, কোয়েম্বাটোরে তারা নানা পেশা ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। দেশের ২২টি রাজ্যে ৩০টি শহরে বাঙ্গালি প্রযুক্তিবিদ, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, সেলস্ মার্কেটিং কর্মী, আমলা, সরকারি কর্মী হিসেবে তাঁরা কাজ করেন। জীবনে একবারও 'বাঙ্গালি' হওয়ার জন্য তারা অপমান বা অবহেলা কিন্তু পাননি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৪৫টি শহরে রমরম করে দুর্গাপূজা হয়। সমস্ত প্রদেশের লোক সেই পূজায় অংশগ্রহণ করে। ভারতের নানা প্রান্তে কোনো বাঙ্গালি ভয়াবহ বিদ্বেষের শিকার তো হনই না, বরং পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এবং এই রাজ্যের অন্ধকার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি দেখে ঘরে ফেরার কথা ভাবতেই চান না।

তাহলে বাইরের রাজ্যগুলিতে কে বা কারা আটক হচ্ছে? কারা হেনস্থা হচ্ছে বলে এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম প্রচার করছে? মেসি স্প্যানিশ বললে যেমন স্পেনের নাগরিক নন, পেলে পর্তুগিজ বললেও পর্তুগালের নাগরিক নন। ঠিক তেমনভাবেই বাংলাভাষায় কথা বললেই ভারতীয় বাঙ্গালি হয় না সবাই। তার ওপর সেই বাংলাভাষায় যদি গোসল, দুলাভাই, নাস্তা, বুয়া, আপা, সালাম— এইসব বিজাতীয় আরবি শব্দ থাকে। ১৯৮০ থেকেই ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন করতে থাকে বাংলাদেশ, মায়ানমার থেকে আসা মুসলমানরা। এই পূর্ব পাপীস্তানিরা ভুয়ো রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড ইত্যাদি বানিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে অসমে ও পশ্চিমবঙ্গে। এর প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভ শুরু হয় অসমে। এরা ধীরে ধীরে মজুর, রাজমিস্ত্রি, রিকশা চালক, হোটেল বয়, সোনার কাজ, জরির কাজ, পোশাক তৈরির কাজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে মুম্বই, দিল্লি। বালাসাহেব থ্যাকারে, মদনলাল খুরানা '৯০-এর দশক থেকেই বাঙ্গালি নয়, বাংলাদেশি খেদাও শুরু করেন।

আজ এই রক্তবীজ দেশজুড়ে, সর্বব্যাপী। ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ভাগ্যনগর, ভাইজাগ, নয়ডা, গুরগাঁও, চেন্নাই, সুরাট, থানে, পুনে, জম্মু, দেরাদুন, হিমাচল, কোচি, এর্নাকুলাম পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে পড়েছে। জাল আধার ও ভোটার কার্ড বানিয়ে, জাল হিন্দু নাম নিয়ে নানা জায়গায় নানাভাবে রোজগার করছে তারা। বিভিন্ন রাজ্যে রীতিমতো কলোনি বানিয়ে ভারতের মূল শত্রু হয়ে উঠেছে তারা। তাদের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে পরিচালিত হচ্ছে জেহাদি নেটওয়ার্ক। শুধু বিজেপি শাসিত নয়, অবিজেপি দলগুলি শাসিত রাজ্যগুলিও এদের বিরুদ্ধে শুরু করেছে সাফাই অভিযান। তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক হলো তার উদাহরণ। ভারতের প্রায় ১২টি রাজ্যের ডেমোগ্রাফি, সংস্কৃতি পর্যন্ত বদলে দিচ্ছে এই অনুপ্রবেশকারীরা।

তাই বাঙ্গালিরা নিজেদের 'বাঙ্গালি' পরিচয় পালটে 'বাং-আলি' রাখবে কিনা সেটা একটা ভাববার বিষয়। ওড়িশাতে ধরা পড়া ৪১৫ জনের মধ্যে ৩৩৫ জনের কাছে পাওয়া গিয়েছে জাল আধার ও ভোটার কার্ড। স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশনের ফলে বিহারে ধরা পড়েছে প্রায় ৩৫ লক্ষ ভুয়ো ভোটার, যাদের একটা বড়ো অংশ পাপীস্তানি, বাং-আলি। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যাটা হতে পারে প্রায় দেড় কোটির কাছাকাছি। অতএব, এদের সাফাই, পুশব্যাক দরকার। ভোটার তালিকা সংশোধন করে দেশ থেকে ৫-৬ কোটি বাং-আলিকে বের করা দরকার। এদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড বাতিল করা দরকার যাতে এরা ভারতীয় নাগরিকত্ব দাবি করতে না পারে। এদেরকে বেনাগরিক করা দরকার যাতে ভারতে এরা কোনোভাবেই চাকরি, রেশন কিছু না পায়, ভোট না দিতে পারে। কঠোর শাস্তি দিলে তবেই তারা ভয় পাবে এবং তারপর অনুপ্রবেশ, লাভ জেহাদ, ধর্মান্তরণ, ইসলামিক জেহাদ বন্ধ হবে। ভারতের চাকরি, রেশন, আবাস, ভোটাধিকার এরা বেআইনিভাবে ভোগ করছে। জাতীয় সুরক্ষা এরা ধ্বংস করছে।

হিন্দু বাঙ্গালির জন্য ১৯৪৭ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ' তৈরি হয়। জেহাদি বাং-আলিদের হাত থেকে বাঁচতে গত ৮০ বছর ধরে প্রায় ২ কোটি হিন্দু বাঙ্গালি পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এই রাজ্যে আসতে বাধ্য হয়েছে। ওপার বঙ্গে হয়েছে অসংখ্য পূর্ণিমার শীলের মতো ঘটনা, জেহাদি-জামাতি প্রশাসনের হাতে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন চিন্ময় প্রভুর মতো সন্ন্যাসী। ধ্বংস হতে হতে পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালি আজ নিশ্চিহ্নপ্রায়। পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলার ডেমোগ্রাফি পালটে গিয়েছে বিগত ২০ বছরে। অসমেও থাবা বসিয়েছে অনুপ্রবেশ। এবার তারা হাত বাড়াচ্ছে গোটা ভারতে। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, ইলা মিত্ররা যতই সেক্যুলার হন, উদ্বাস্তু হওয়ার কারণগুলো চেপে যান বা ইতিহাস বিকৃত করুন পাপীস্তানি বাং-আলিদের কাছে তারা মুশরিক, মালাউন, কাফের ছাড়া কিছুই নয়। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে ঋত্বিক ঘটক বা সত্যজিৎ রায়ের জমিজমা, বাড়ি তাদের কাছে গণিমতের মাল। নারীর সম্মান হরণ, জমি-বাড়ি লুট তাদের স্বাভাবিক সংস্কৃতি। বাঙ্গালিকে এর বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ। প্রয়োজনে নিতে হবে প্রতিশোধ। উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে আমরা ভারতীয় বাঙ্গালি, আমরা পাপীস্তানি বাং-আলি বা বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা মুসলমান নই।

ভারতে অনুপ্রবেশ করা জেহাদিদের একটা বড়ো অংশ বাংলাদেশের আনসারুল্লা বাংলা টিম, জামাত-ই-ইসলামি, হেফাজত-ই-ইসলাম, হিজবুত তাহরির ইত্যাদি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ভারতে এরা পিএফআই, এসডিপিআই-এর সঙ্গে জড়িত। ভারতের যে রাজ্যে যেতে হবে, সেই বুঝে এরা ভাষার ট্রেনিং নেয়। তারপর পরিবার, বাচ্চা-সহ ঢুকে পড়ে ভারতে। গন্তব্য কেরালা হলে মালয়ালম, ব্যাঙ্গালোর হলে কন্নড়, চেন্নাই হলে তামিল, ওড়িশা হলে ওড়িয়া, মুম্বই বা থানে হলে মারাঠি, আমেদাবাদ বা সুরাট হলে গুজরাটি আর ভারতের অন্য কোনো জায়গায় ডেরা তৈরি করলে হিন্দি ভাষা রপ্ত করে এই অনুপ্রবেশকারীরা। হিলি, বৈষ্ণবনগর, শীতলকুচি, বারাসাত, বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে এরা এদেশে ঢোকে। তারপর সামান্য সময়ের মধ্যে আধার ও ভোটার কার্ড-সহ জাল হিন্দু নাম ও পরিচয় তৈরি করে এজেন্টদের মাধ্যমে পৌঁছে যায় বিভিন্ন রাজ্যে। যেখানে ঘাঁটি তৈরি করবে, ভারতের সেই প্রদেশের ভাষায় ওরা যতক্ষণ না ফ্লুয়েন্ট হচ্ছে ততক্ষণ অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে এদের গ্রিন সিগনাল দেয় না আনসারুল্লা, জামাত, হেফাজত। এই প্রতিবেদক বাংলাদেশে গিয়ে দেখেছে যে, সেখানে নানা জায়গায় হাজার খানেক ভাষা শেখার ক্লাস চলে। ভারতে ঢুকে তারা বলে দাদা-পরদাদার সময় থেকে আমরা রাজকোটে আছি, রায়পুরে আছি।

যেসব ভারতীয় পরিচয়পত্র এরা দেখায়, তা সবটাই জাল। মুসলমান নামে পরিচয়পত্র বানানোর পরিবর্তে হিন্দু নাম ব্যবহার করে জাল পরিচয়পত্র তৈরির প্রবণতা এখন ক্রমবর্ধমান। আধার বা ভোটার কার্ড ধরে পুলিশ ভেরিফিকেশন হলে দেখা যায় মুর্শিদাবাদ, মালদা, কোচবিহার, উত্তর বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোনো ঠিকানা বেরোচ্ছে। সেই ঠিকানাও জাল।

ইদানীং এই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বেশ তৎপর হয়েছে। দিল্লিতে পাহাড়গঞ্জ জয় হিন্দ কলোনি, রাজৌরি গার্ডেন, দিল্লি গেট অঞ্চলে তৈরি হওয়া এই অনুপ্রবেশকারীদের বস্তিগুলিতে চলছে ধরপাকড়। পুলিশ পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে ৯০ শতাংশ কোনো ডকুমেন্ট দিচ্ছে না। যারা পরিচয়পত্র দেখাচ্ছে, তাদের পরিচয়পত্র জাল বেরোচ্ছে। কিন্তু দিল্লিতেই বাঙ্গালি অধ্যুষিত অঞ্চল চিত্তরঞ্জন পার্ক, গ্রেটার কৈলাসে তো এই ঝামেলা নেই। হোটেল বয়, মাংসের দোকানদার, অটো-রিকশাওয়ালা, গার্মেন্টসের দোকানের কর্মচারী, ঝুপড়িবাসীদের অধিকাংশই অনুপ্রবেশকারী। এদের মালিকদের বিরাট চক্র, যাদের হাত আমেরিকা-ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়াতেও বিস্তৃত। এখানেও মুম্বই, পুনে, থানে, ব্যাঙ্গালোর, রায়পুর, ভোপাল, চেন্নাই, ভাগ্যনগরে একই চিত্র। যারা এদের কাজ দেয় তারা জানে যে এরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, বাং-আলি, পাপীস্তানি। সেই সুযোগে অনেক কম খরচে প্রতিদিন কাজ করায়। কোনো রাজ্যে স্থানীয় শ্রমিকরা রোজ হিসেবে ৮০০ টাকা পেলে, এই বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের দিয়ে ৫০০ টাকায় সেই কাজ করানো হয়। আমেরিকাতেও অনেক জায়গায় এক ব্যাপার। যাদের বৈধ ভিসা রয়েছে, তাঁরা বার্গার কিং বা কোনো বারে কাজ করলে প্রতি ঘণ্টায় পায় ৮ ডলার। কিন্তু সেই দেশে একই কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারী বাং-আলি বা আফ্রিকানরা প্রতি ঘণ্টায় কাজের ক্ষেত্রে পায় ৩-৪ ডলার।

বর্তমানে আমাদের দেশজুড়ে যা চলছে, তাকে এক কথায় বলা যায় 'অনুপ্রবেশ : বিনা যুদ্ধে ভারত দখল'। এই একই অদৃশ্য যুদ্ধ দেখা যাচ্ছে আমেরিকা-ইওরোপ-ভারত জুড়ে। একই মজহবের একটি ঘৃণ্য জাতি বিভিন্ন দেশে ঢুকে জন্ম দিচ্ছে নানা পাপের। তারা কিন্তু সিরিয়া বা মালয়েশিয়ায় ঢুকতে পারবে না বা ঢুকবে না। আসবে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, বেলজিয়ামে বা ভারতে। সমুদ্রে কঠোর নজরদারির দরুন মালদ্বীপ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ যদিও কম।

বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজের ফলে উদ্ঘাটিত তথ্য হিমশৈলের চূড়া মাত্র। ব্যাঙ্গালোর, মুম্বই, দিল্লি, ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, ভাগ্যনগরে এই অনুপ্রবেশকারীরা প্রায় জনবিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও অসম হলো এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো হিমালয়ের দু'টি চূড়া। প্রায় ৬ কোটি বাং-আলি, পাপীস্তানি, বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা মুসলমান এই মুহূর্তে ভারত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের জন্য ১০-১২ হাজার ভারতীয় বাঙ্গালি সম্মুখীন হচ্ছেন নানা ঝামেলার। কিন্তু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পর মুক্ত হচ্ছেন। বৈধ পরিচয়পত্র, আধার কার্ড, বাবা-মায়ের নাম-ঠিকানা দিয়ে ভেরিফিকেশন হওয়ার পর তাঁরা ঝঞ্ঝাটমুক্ত হয়েছেন।

গত ৮০ বছর ধরে এই বাং-আলিরা যে পরিমাণ হত্যা, লুঠ, ধর্ষণ, জমিজমা, সম্পত্তি দখলের সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে বাঙ্গালির ওপর তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পূর্ব পাকিস্তানে এবং পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালির ঘরের নারীকে তারা যেভাবে নির্যাতন করেছে, তাঁদের জমি, রাস উৎসব, কীর্তনের আসর, মঠ-মন্দির, গৃহদেবতার বিগ্রহ, তুলসীমঞ্চকে যেভাবে ধ্বংস ও অপবিত্র করেছে, তার তুলনায় ভারতের অন্য কোনো জাতি বা অন্য কোনো প্রদেশের মানুষ কোনো অত্যাচার তো দূর, সামান্য অসম্মান পর্যন্ত করেনি। ব্রিটিশরা এককালে চরম অত্যাচার করেছে বাঙ্গালিকে। অসমে কংগ্রেসের শাসনকালে মূলত বোড়ো আর বাং-আলিরা মিলে অত্যাচার ও সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে বাঙ্গালিদের ওপর। বর্তমান অসম সরকার এই অনুপ্রবেশকারী, বাং-আলিদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্জাবি, বিহারী, রাজাকার মুসলমান জেহাদিদের দল নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে বাঙ্গালিদের ওপর। বর্তমানে জেহাদি প্রশাসনের কবলে পড়ে এপার ও ওপার বঙ্গে বাঙ্গালির যেন পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটছে। ধুলিয়ান, মোথাবাড়ি, শীতলকুচি, ডালখোলা, কালিয়াগঞ্জ, দিনহাটা, কাটোয়া, সমুদ্রগড়, চাঁপদানি, রিষড়া, ধূলাগড়, সলপ, পাঁচলা, আমতা, জগদ্দল, শিবপুর, মোমিনপুর, মহেশতলা, উস্তি, মগরাহাট, সন্দেশখালি, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, দেগঙ্গা, টাকি, বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, ফলতা, আমতলা, কাকদ্বীপ, গোসাবা, ভেকুটিয়া, বেলডাঙ্গা, নানুর, হাসন, চাপড়া-সহ বিস্তীর্ণ পশ্চিমবঙ্গ যা একদা বাঙ্গালির হোমল্যান্ড হিসেবে তৈরি হয়েছিল, জনবিন্যাস পালটে যাওয়ার কারণে তা আজ বাং-আলিদের পদতলে উপনীত হয়েছে!

বাং-আলি ছাড়া ভারতের আর কোনো জাতি বাঙ্গালি হিন্দুকে এত অত্যাচার, অসম্মান করেছে? তামিল, বিহারী, ওড়িয়া, গুজরাটি, তেলুগু, রাজস্থানী বা পঞ্জাবি? বরং তাঁরা বাঙ্গালিকে অসম্ভব সম্মান করেছে। চেন্নাই গিয়ে এই প্রতিবেদক দেখতে পেয়েছে যে, টি নগর, বসন্ত নগরে বাঙ্গালিদের কী সম্মান। দেশজুড়ে প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ, ব্যাংকার, আইটি ইঞ্জিনিয়ার, বায়োটেকনোলজিস্ট, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ডাক্তার, অ্যাডভোকেটদের মধ্যে উজ্জ্বল ও প্রকট বাঙ্গালি মেধা। মেধাবী বাঙ্গালিরা গোটা দেশ ও বিশ্বজুড়ে উচ্চ-প্রতিষ্ঠিত। এর উলটো চিত্রও রয়েছে। দেশজুড়ে বাঙ্গালিরা সম্মানে আসনে অধিষ্ঠিত থাকলেও বাং-আলিদের কোনো মান-সম্মান নেই। চেলামত্তম, হোসুরে অবৈধ বাং-আলিদের বস্তির নোংরা, পূতিগন্ধময় পরিবেশের চিত্র রয়েছে। কলকাতাতেও আমরা যা দেখে অভ্যস্ত। হুকিং, মাংসের খোলা দোকান, ঝুপড়ি, চামড়ার গুদাম, দুর্গন্ধময় এই বস্তি বা কলোনিগুলি যেন অন্য এক পৃথিবী। ভারতের কোথাও কোথাও এই কলোনিগুলি সদ্য গজিয়ে উঠেছে বলে খবর। ৫-৭ বছর আগেও এদের অস্তিত্ব ছিল না। এদের মধ্যে প্রতি ১০০ জনে ৮০ জন অবৈধ পরিচয়পত্রধারী। তারা অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের ভোটার বা আধার কার্ড জাল জেনেও অনেক কম খরচে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য স্থানীয় লোকজন তাদের কাজে রাখত। এরাই নোংরা কলোনিগুলি বানাতো, একটি ইলেকট্রিক লাইন থেকে হুকিং করে ৪০টি ঘরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করত আর বাড়ি ভাড়া বলে তো কিছুই নেই। এই সুযোগে এদের তৈরি কলোনিতে থাকতে আসত দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুরের মুসলমানরা। বিভিন্ন রাজ্যে সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলির সৌজন্যে তারা নানা অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পেত। উদ্বাস্তু হওয়া বাঙ্গালি জানে যে, অন্য কোনো ভাষাভাষী নয়, গত ১০০ বছর ধরে তাদের ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে দু'পারে একই ধরনের আরবি-জারিত, বাংলাদেশি ভাষায় কথা বলা, এক মরুসংস্কৃতির বাং-আলিরা। এই জেহাদি অনুপ্রবেশকারীরা তাদের দেশ পূর্ব পাকিস্তানকে শেষ করেছে। তারপর পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ঘটিয়েছে। আর এখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এই রক্তবীজরা। ভারত থেকে এদের তাড়ানোর লক্ষ্যে সর্বাত্মক অভিযান আশু প্রয়োজন। □

বিশ্ব বাণিজ্যে ট্রাম্পের দাদাগিরি রুখবেন বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদী

প্রদীপ মারিক

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই হলেন বিশ্ব-রাজনীতিতে শান্তির দূত। বিশ্ব দরবারে মোদীজী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ভারত যুদ্ধের পক্ষে নয়, শান্তির পক্ষে। ভারত কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানেই বিশ্বাস করে। রাশিয়া-ইউক্রেনের শান্তি পুনরুদ্ধারের প্রতিটি প্রচেষ্টায় ভারত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার সংঘর্ষ থামাতে মোদীজী ব্যক্তিগত ভাবে ভূমিকা রাখতেও প্রস্তুত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠনেতা নরেন্দ্র মোদী প্রত্যেকটি বিদেশ সফরে বলেছেন, ভারত নিরপেক্ষ নয়, ভারত প্রথম থেকেই পক্ষ নিয়েছে এবং তা শান্তির পক্ষে। বিশ্বনেতা মোদীজীর দিকে তাকিয়ে আছে সমগ্র বিশ্ব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতির পাগলামি ও হুঁশিয়ারি একজনই সামলাতে পারবেন তিনি হলেন মোদী। সারা বিশ্ব আজ ভারতের দিকে তাকিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়া টুইটারে সক্রিয় বর্তমান বিশ্ব নেতাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় ১০০ মিলিয়ন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘লিবারেশন ডে’ নামে অভিহিত করে বিভিন্ন দেশের ওপর ‘প্রতিশোধমূলক’ শুল্ক ঘোষণা করেছেন। এরপর থেকে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত বেশ কয়েকবার পালটিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা করেছেন, যা মার্কিন বাণিজ্য নীতিতে একটি বড়ো ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। কারণ এর পরিণাম হতে চলেছে উলটো। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর গভীর প্রভাব পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। ভারত এই বাণিজ্য আক্রমণের প্রথম দফায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হলেও, বুধবার ট্রাম্প এই শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করেন। নির্বুদ্ধি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এই শুল্ক ভারতীয় পণ্যের উপর আরোপ করবে, বিশেষভাবে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানির কারণে। এই পদক্ষেপটি রাশিয়ার ইউক্রেন হামলা মোকাবিলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জরুরি অবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এছাড়া, ট্রাম্প একাধিক মার্কিন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এই শুল্ক কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বর্তমানে মার্কিন বাণিজ্যিক শুল্ক আরোপ করার প্রয়োজন ছিল, তবে ট্রাম্পের পাগলামি শুল্ক নীতির ফলে সমগ্র বিশ্বের

> **‘আমরা (ট্রাম্পের) অনেক বিবৃতির কথাই শুনছি, যেগুলি আসলে হুমকি। বিভিন্ন দেশকে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা এই বিবৃতিগুলিকে বৈধ এবং ন্যায্য বলে মনে করছি না।’**
>
>
>
> **—রুশ প্রশাসনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ**

ফঃ ৩

বাজারে প্রভাব পড়বে। ভারতীয় পণ্যের উপর ট্রাম্প ৫০ শতাংশ কর চাপাতেই টাকার তুলনায় দুর্বল হলো ডলারের দাম। ভারতীয় টাকার দাম ৩ পয়সা বেড়েছে। ফলে ১ ডলারের দাম ভারতীয় মুদ্রায় হয়েছে ৮৭.৬৯ টাকা, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করার জন্য বুধবারই ভারতীয় পণ্যে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাড়তি ২৫ শতাংশের ফলে আগামী ২৭ আগস্ট থেকে ভারতকে আমেরিকায় পণ্য রপ্তানি করতে হলে ৫০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে।

পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখা দেশগুলির উপর 'আরও অনেক' বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। তবে এর জবাবও দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। শুধু ভারতবর্ষ নয় প্রায় ৯০টি দেশের ওপর বিভিন্ন হারে শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। সমগ্র বিশ্ব চাইছে বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদী আমেরিকাকে কড়া বার্তা দিক। শুল্ক বা টারিফ হচ্ছে একটি সরকারি ফি বা কর, যা বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর বসানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রকে এই শুল্ক পরিশোধ করে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো, যারা পণ্য আমদানি করছে, তাদেরই এ অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হয়। এই অর্থ জমা পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ 'অন্যায় ও অযৌক্তিক' বলে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। পাশাপাশি স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, 'জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে ভারত।' বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক বাজারদরের কথা মাথায় রেখে ভারত তার বাণিজ্যনীতি নির্ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ বাজারে কে কত দাম নিচ্ছে, তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

রাশিয়া সস্তায় তেল বিক্রি করে বলেই ভারত তা কিনে থাকে। ভারত ট্রাম্পের শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্তকে 'অন্যায্য' বলে দাবি করেছে। আর ভারতের বিবৃতির পরেই মুখ খুলেছে রাশিয়া। ক্রেমলিনে রুশ প্রশাসনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, 'আমরা (ট্রাম্পের) অনেক বিবৃতির কথাই শুনছি, যেগুলি আসলে হুমকি। বিভিন্ন দেশকে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা এই বিবৃতিগুলিকে বৈধ এবং ন্যায্য বলে মনে করছি না।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে কোনো সার্বভৌম দেশের স্বাধীন ভাবে বাণিজ্যসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। নির্দিষ্ট কোনো দেশের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী এই বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক বোঝাপড়া হয়ে থাকে।' পেসকভের বক্তব্যে কোথাও ভারতের নাম না করা হলেও ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ যে ট্রাম্পের এই শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে ভারতের পাশে দাঁড়াচ্ছে, তা স্পষ্ট। এদিকে, মার্কিন শুল্ক নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অ্যালুমিনিয়াম, সার, রেলপথ এবং খনির প্রযুক্তিতে সহযোগিতা আরও গভীর করার জন্য একটি প্রোটোকল স্বাক্ষর করেছে ভারত ও রাশিয়া।

এরই সঙ্গে রেয়ার আর্থ খনিজ পদার্থ নিয়েও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়েও চুক্তি হয়েছে দুই দেশের। এর পাশাপাশি ট্রাম্পের শুল্ক নীতির কড়া সমালোচনাও করেছে বিশেষজ্ঞ মহল। ভারতবর্ষ বিশ্বকে জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ বা ধ্বংস দেয়নি, বিশ্বের কাছে গৌতম বুদ্ধের বাণী, শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। ট্রাম্পের এই শুল্ক নীতির প্রতিবাদ করে ভারত বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। সমগ্র বিশ্ববাসী মনে করে যে, ট্রাম্পের আর্থিক নীতি বিশ্ব অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। যেসব পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে আমেরিকা বিভিন্ন দেশের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, সেগুলির ওপর শুল্কবৃদ্ধি ঘটলে আমেরিকায় সেগুলি অমিল হতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সম্মুখীন হবে আমেরিকাবাসী। সকলের আশা যে, মোদীজীর প্রচেষ্টায় হয়তো আমেরিকার শুভবুদ্ধির উদয় হবে। ট্রাম্প অতিরিক্ত শুল্ক কমাতে বাধ্য হবেন। মোদীজীর অনমনীয় অবস্থানের কারণে এই ধ্বংসাত্মক নীতি থেকে সরে আসতেও বাধ্য হবেন ট্রাম্প। □

ক্রীড়া ভারতী

ক্রীড়া জ্ঞান পরীক্ষা-২০২৫ (অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা)

তারিখ-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রবিবার।

সময়- সকাল ৫টা থেকে বিকাল ৫টা।
পরীক্ষার্থীর বয়সসীমা ন্যূনতম ১২ বছর।
মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার যেকোনো মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়া যাবে।

প্রতি পরীক্ষার্থীর সহযোগ রাশি ২০ টাকা।

নাম পঞ্জীকরণ
https://kreedabharati.org/
ক্রীড়া ভারতীর এই ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম রেজেস্ট্রি করা যাবে।
পরীক্ষার রেজাল্ট ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা (২জন বিজয়ীর জন্য)

দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা (৬জন বিজয়ীর জন্য)

তৃতীয় পুরস্কার ১১ হাজার টাকা (১১জন বিজয়ীর জন্য)

যোগাযোগ ঃ

কৌস্তভ ঘোষ-৮৭৬৮৭৭৩৪৭৪।
বোধিসত্ত্ব মুখার্জী- ৮১৪৫৪৪৫১০৮।
রুদ্র কুমার ঠাকুর -৯৯০৩০৩৭১৮।

জলের অপচয় রোধে মহিলাদের ভূমিকা

অপরূপা সেন

গোটা বিশ্বেই আজ পানীয় জলের জন্য হাহাকার বাড়ছে। আমাদের দেশেই রাজস্থানে শুখা মরসুমে একটু জলের জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হয় মহিলাদের। গরমের সময় দেশের অনেক রাজ্যেই কম-বেশি জলের সঙ্কট দেখা দেয়। আমরা যদি প্রতিদিনের ব্যবহারে জল খরচে একটু নিয়ন্ত্রণ আনতে পারি তাহলে জলের সমস্যা অনেকটাই মেটানো সম্ভব হবে।

আমাদের বেশিরভাগ জল নষ্ট হয় রান্নাঘরে। সেই দিকটা কিন্তু আমরা এড়িয়ে যাই। অনেক সময় আমরা টেরই পাই না যে কীভাবে জল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জলের জোগান অপর্যাপ্ত থাকায় আমরা এই জল বাঁচানোর বিশেষ একটা চেষ্টা করি না।। বাসন ধোয়ার সময় আমরা রান্নাঘরের সিঙ্কে কল চালিয়ে দিলাম। কল চালিয়ে অন্য কাজে মন দিলাম। আমরা যদি সেসময় একটু সতর্ক হই তাহলে জলের অপচয় কিছুটা হলেও কম হয়।

সাবান দিয়ে আপনি যখন বাসন মাজছেন তখন কলটা মনে করে বন্ধ করে দিন। কারণ এই সময়ে আপনার কল খুলে রাখার আদৌ কোনো প্রয়োজন নাই। কলের মুখটা এই সময় ভালো করে বন্ধ করে দিন। একটুও জলের অপচয় যেন না হয়। সাবান দিয়ে সব বাসন মেজে নেওয়ার পর কল চালিয়ে বাসনগুলো ধুয়ে ফেলুন। এতে আপনার জল বাঁচবে। তাতে জলের সঞ্চয় বাড়বে। পাম্পের মাধ্যমে বারবার জল তোলার প্রয়োজন পড়বে না।

ওয়াটার পিউরিফায়ার কিন্তু জল অপচয়ের একটা বড়ো কারণ। শুনে অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়! কিন্তু এটাই সত্যি। কম লোকেই জানে যে, পিউরিফায়ারের ট্যাংকে এক লিটার জল জমা করতে তিন লিটার জল নষ্ট করতে হয়। তাই বলে কি পিউরিফায়ার ব্যবহার করবেন না? তা নয়। স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে তো পিউরিফায়ার ব্যবহার করতেই হবে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনো আপোশ করা যায় না। পরিশ্রুত জলই পান করতে হবে। কিন্তু পিউরিফায়ারে যে জলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই বাড়তি জলটা অন্য কোথাও ধরে রাখুন। আর সেটা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করুন। এই বাড়তি জলকে আপনি অনেক কাজে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন ধরুন, ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচতেও আপনার অনেকটা জলের প্রয়োজন হয়। এই বাড়তি জল সেই কাজে ব্যবহার করুন। আবার ধরুন, আপনার যদি গাড়ি থাকে, সেই গাড়ি ধোওয়ার কাজেও বাড়তি জল অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন।

আবার যে জলে আপনি শাকসবজি ধুয়ে নেন সেই জলকেও অন্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। শাকসবজি ধোওয়া জল কোনো একটা বড়ো পাত্রে ভর্তি করে নিন। এবার সেই জল বাড়িতে যে ফুলের টব রয়েছে তাতে দিতে পারেন। কারণ বাড়ির গাছের পরিচর্যার জন্যও প্রতিদিন অনেক জলের প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে এই জল। আলাদা করে আপনারে আর কলের জল ব্যবহার করতে হবে না।

ডিমসেদ্ধ আমাদের প্রায় সকলেরই একটা প্রিয় খাবার। সেই ডিম সেদ্ধ করতে বেশ কিছুটা জলের প্রয়োজন পড়ে। জলটা ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই জল বাঁচানোর একটা সহজ উপায় রয়েছে। ডিম সেদ্ধ করতে ইলেক্ট্রিক বয়লার ব্যবহার করুন। সেদ্ধও হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। এতে সময়ও কিছুটা সাশ্রয় হবে।

জল সাশ্রয়ের আরও একটা সহজ উপায় রয়েছে। আমরা সাধারণভাবে কাউকে জল দেওয়ার সময় গ্লাস ভর্তি করে জল দিই। কিন্তু খুব তেষ্টা না পেলে কেউ সব জলটা পান করেন না। ফলে কিছুটা পান করে বাকিটা ফেলে দেন। এতে জলের অপচয় হয়। অতিথিকে অর্ধেক গ্লাস জল দেওয়া অভ্যাস করুন। তাতে যদি তার তেষ্টা না মেটে তিনি চেয়ে নিতে পারবেন। এতে জলের অনেক সাশ্রয় হবে।

যে কোনো কিছু রান্না করার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিন। প্রথমেই অতিরিক্ত জল দিয়ে পরে তা নষ্ট করবেন না। এতেও জল কিছুটা হলেও বাঁচাতে পারবেন। এগুলি খুব সাধারণ বিষয় হলেও একটু মনে করে দেখবেন আমরা প্রতিদিন নানাভাবে জলের অপচয় করি। গৃহিণীরা একটু মনোযোগী হলেই জলের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। □

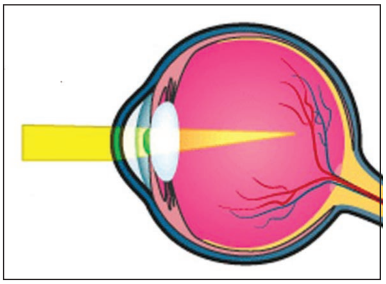

মায়োপিয়া থেকে সাবধান

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

চোখ অত্যধিক চাপ সামলাতে না পেরে স্বল্পদৃষ্টি বা নিকটদৃষ্টি সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে, ডাক্তারিশাস্ত্রে যার পোশাকি নাম হলো 'মায়োপিয়া'। যখন আমাদের চক্ষুগোলকটি সামনের দিক থেকে পিছন দিকে খুব বেশি লম্বা হয়ে যায় এবং আকৃতিটা গোলাকারের পরিবর্তে উত্তলাকার হয়ে ওঠে তখন এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মায়োপিক লোকেদের আই-বল বা অক্ষিগোলক দীর্ঘ হওয়ার ফলে কর্নিয়াকে (রক্ষাকারী বাইরের স্তর) বেশি বাঁকা করে তোলে। এর ফলে চোখের মধ্যে যে আলো প্রবেশ করে সেটা সরাসরি রেটিনার উপর না পড়ে কিছুটা সামনে গিয়ে পড়ে। এর ফলে চোখ বস্তুটিকে ফোকাসে আনতে অপারগ হয় এবং দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে ওঠে। নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ফেইনবার্গ স্কুল অফ মেডিসিনের অপথ্যালমোলজি অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সের সহযোগী অধ্যাপক গ্রেগরি সোয়ার্টজ জানাচ্ছেন, চোখের বৃদ্ধির একটা 'স্টপ সিগন্যাল' আছে যার পরিপ্রেক্ষিতে মাথার সঙ্গে চোখের আকৃতি বৃদ্ধির মধ্যে একটা সাযুয্য থাকে। সেক্ষেত্রে বংশগত বা পরিবেশগত কারণে এই সাযুয্যের বিঘ্ন ঘটে তখনই অপটিকসের (লেন্স ও কর্নিয়ার যৌথব্যবস্থা যার সাহায্যে আমরা কোনো বস্তু বা দৃশ্যের উপর নজর ফোকাস করতে পারি) তুলনায় আই-বলের অসমানুপাতিক বৃদ্ধি ঘটে। চক্ষুগোলক আর অপটিকসের এই অসঙ্গতির ফলেই কিছু দূরের জিনিস অনেকটা নজরের বাইরে চলে গিয়ে আবছা হয়ে ওঠে, এটাই হলো মায়োপিয়া রোগের লক্ষণ।

মায়োপিয়া রোগের উপসর্গ খুঁজতে গেলে প্রথমেই আসবে দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসা, তার সঙ্গে মাথাধরা, চোখের যন্ত্রণা এবং অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়া। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এই রোগের কারণ হিসেবে প্রথমেই ইলেক্ট্রনিক স্ক্রিনের কথা মনে হলেও আসল কারণ হলো ঘরের বাইরে প্রকাশ্য আলোকে কম সময়যাপন। আধুনিক জীবন অনেকটাই ঘরকেন্দ্রিক। চার দেওয়াল, মাথার উপর পাখা, বৈদ্যুতিক আলো আর ঠাণ্ডা মেশিনের আরাম ছেড়ে বাইরের প্রাকৃতিক আলো-বাতাস ভরা দুনিয়ার স্বাদ নিতে আমরা ভুলে গেছি। সূর্যালোক ডোপামিনকে প্রভাবিত করে যার ফলে চক্ষুগোলকের সুস্থ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। অন্দরমহলের কৃত্রিম আলোয় সেটা ঘটে না। একজন শিশুর সারাদিনে অন্ততপক্ষে দুঘণ্টা প্রাকৃতিক আলোর মধ্যে থাকা উচিত। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে মানুষেরা অনেক বেশি সময় ঘরের বাইরে থাকেন তাঁদের স্বল্পদৃষ্টিজনিত সমস্যা কম হয়।

কিন্তু ইলেকট্রনিক ডিভাইসের অবদানও এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত ডিভাইসে যে স্ক্রিনটা থাকে সেটা সবসময় হাই কন্ট্রাস্ট বা উচ্চবৈষম্যযুক্ত হয়। যেমন, সাদা স্ক্রিনে কালো অক্ষর বা গাঢ় স্ক্রিনে হালকা রঙের লেখা ইত্যাদি। বিজ্ঞানীদের মতে, অন্ধকার ঘরে দীর্ঘক্ষণ ধরে উজ্জ্বল স্ক্রিনে পড়াশোনা, গেম খেলা বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে যেটা পরবর্তীতে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মায়োপিয়া রোগের কারণ হতে পারে। ২০১৮ সালে এই সংক্রান্ত একটি বৈজ্ঞানিক সার্ভের ফল জানাচ্ছে, স্ক্রিনের পরিবর্তে প্রাকৃতিক আলোয় পাঠ করলে মায়োপিয়ার প্রকোপ অনেক কমানো যেতে পারে কোভিড-১৯ একদিকে আমাদের ঘরবন্দি জীবন কাটাতে বাধ্য করেছিল, অন্যদিকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে সবাইকে পুরোপুরি মোবাইল নির্ভর করে তুলেছে। এক মুহূর্ত তাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারি না। কিছুক্ষণের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা চলে গেলে একটা সব হারানোর অনুভূতি গ্রাস করে, যেন আমাকে কেউ বিজন দ্বীপে ফেলে রেখে চলে গেছে, যেখান থেকে সভ্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো আশা বেঁচে নেই। সবচেয়ে ভয়ের কথা, এই মোবাইলময় জগতে মানুষ একা একা বাঁচতে শিখছে যেটি আগামী দিনে সমাজব্যবস্থার ধরণটাই বদলে দিতে পারে।

গবেষক চিকিৎসকরা এই রোগের ক্রমবৃদ্ধির জন্য চিন্তিত। তাঁরা জানাচ্ছেন কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখলে এই রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলতে পারে— ১. পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজ উপযুক্ত আলোতে করতে হবে; ২. কম্পিউটার, মোবাইল, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বেশি চোখধাঁধানো স্ক্রিন পরিহার করা জরুরি; ৩. মাঝে মাঝে ইলেকট্রনিক পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে চোখের বিশ্রাম দিতে হবে।

নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটান আই হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ইয়ুনার‍্যাপোর্ট জানাচ্ছেন, সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি মিনিটে ১৮ বার চোখের পলক পড়ে। যখন আমরা কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে কাজ করি তখন সেই সংখ্যা কমে গিয়ে প্রতি মিনিটে হয়। ফলস্বরূপ চোখের জলীয় ভাব কমে গিয়ে চোখ শুকনো হয়ে ওঠে এবং জ্বালা করতে শুরু করে। তাঁর পরামর্শ হলো, '২০-২০-২০ নিয়ম' অনুসরণ করা। এই নিয়ম অনুযায়ী ২০ মিনিট কম্পিউটারে কাজ করার পর, ২০ ফুট দূরে ২০ সেকেন্ড একভাবে তাকিয়ে থাকা উচিত।

মায়োপিয়া অসুখটি তীব্রতার নিরিখে দুধরনের হতে পারে— উচ্চ মায়োপিয়া এবং ডিজেনারেটিভ মায়োপিয়া। প্রথম ক্ষেত্রে চশমা ও কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করে রোগের মোকাবিলা করা সম্ভব। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিসরণমূলক অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। তবে ডিজেনারেটিভ মায়োপিয়া বিরল হলেও এই রোগে শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হয়। এই ধরনের মায়োপিয়া চোখের আলো সংবেদনশীল এলাকার (রেটিনা) সম্পূর্ণ ক্ষতি করে দেয়। এর ফলে একজন শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে। ▯

আমেরিকা ও চীনের দড়ি-টানাটানির মাঝে শক্তিধর ভারতের আত্মপ্রকাশ

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

মার্কিন মুলুকে একটি বিষয় জোর চর্চা চলে ডোনাল্ড ট্রাম্প যত না রাজনীতিবিদ তার থেকে ব্যবসায়িক প্রবণতা তার বেশি। ট্রাম্পের নির্বাচনে আমেরিকার তেল কোম্পানিগুলি প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। ট্রাম্প এখন তার প্রতিদান দিতে ব্যস্ত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দেন ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না করে তবে আমেরিকা ভারতের ওপর কঠোর sanction বা আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। ভারত আর রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে কিনা তা আমেরিকা লক্ষ্য রাখছে। যার অর্থ ট্রাম্পের হুমকিতে ভারত ভয় পেয়েছে কিনা? বাস্তব হলো রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের তেল চুক্তি অনেক দিনের, যা রাতারাতি থামানো সম্ভবপর নয়। যা আমেরিকার কাছে বড়ো ধাক্কা। 'New York Times'-এ প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই আধিকারিক জানিয়ে দেন ভারতের তেল নীতির কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। এটা তেল কেনা বা না কেনা নয়, ভারতের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে কোনো আপোশ করা হবে না। ভারতের Global Trade Policies-এর ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে যার সারমর্ম হলো 'No pressure no surrender'। মনে রাখতে হবে, এই ভারত ১৯৯০-এর ভারত নয়, ২০২৫-এর ভারত যাকে সারা পৃথিবী বিশ্বগুরুর মর্যাদা দিয়েছে।

প্রশ্ন হলো, ভারত কেন এত বড়ো একটা ঝুঁকি নিচ্ছে? পুরনো বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব চলে যেতে পারে ভেবে না অন্য কোনো কারণ আছে? অর্থনৈতিক কারণ হলো, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে যে তেল পাচ্ছে তা ভালো মানের শুধু নয়। বাজার দামের থেকে অনেক কম দামে। পূর্বতন বৈঠকে জি-৭ ৬০ ডলার প্রতি ব্যারেলের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। রাশিয়া থেকে ভারত তার থেকেও কম দামে তেল কিনে আন্তর্জাতিক আইন-সহ তেলের গুণমান ও নিজস্ব স্বার্থও বজায় রাখল। এর ফলে ভারতের অয়েল পুল ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকছে, বাজার দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হচ্ছে এবং মুদ্রাস্ফীতির লাগাম দেওয়া যাচ্ছে। বিদেশী মুদ্রাও সুরক্ষিত রাখা সম্ভবপর হচ্ছে। ভারতের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ৩০৪ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৭০৪ বিলিয়ন ডলার হয়েছে ২০১৪ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে। স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম নীতি ভারত অনুসরণ করছে। প্রত্যেক দেশ যুদ্ধ বিগ্রহ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে তেল মজুত রাখে। ভারতের কাছে মজুত তেল জীবনদায়ী অর্থনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

ভারত তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির বার্তা বিশ্বের কাছে দিয়ে রেখেছে। ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব বিসর্জন দিয়ে নয় যা Multi Alignment Policies নামে পরিচিত। সবার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে কিন্তু নিজের দেশের স্বার্থ সবার আগে। ট্রাম্প ভারতকে শুধু হুমকিই দেননি শুল্ক এক লপ্তে ২৫ শতাংশ এবং অনতিবিলম্বে ৫০ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করেছেন। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার যখন ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে বৈরী একটি দেশ ভারতের পাশে এসে দাঁড়ায় যার নাম চীন। চীনের সরকারি মুখপাত্র গ্লোবাল টাইমস ভারতের পক্ষে দাঁড়ায়। ভারত এখন Dynamic Balancing এর পথে হাঁটছে। যা Independent Foreign Policy নামে বেশি পরিচিত। জাতীয় স্বার্থে এই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এটা কোনো খবর নয়, এটা একটি Diplomatic Master Stroke.

কোনো শক্তি চাইলেই এই নতুন ভারতকে ঘিরে ফেলতে পারবে না। অনেক শক্তি আছে যারা আমেরিকার প্রতিপক্ষ যাদের চোখ এখন ভারতের দিকে। ভারত এখন এতটাই ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে। মনে রাখতে হবে, ভারত একটা বাজার নয় বরং বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ। এই দড়ি টানাটানির খেলা যতটা শক্তিশালী এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ। যতদিন ভারসাম্যের নীতি চালিয়ে যাওয়া যাবে, ততদিন ভারসাম্যের নীতি চালিয়ে যাওয়া যাবে, ততদিন লাভ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এটা যদি একপক্ষের ভরসা নষ্ট করে, তখন অন্য পক্ষ দ্বিধায় পড়ে

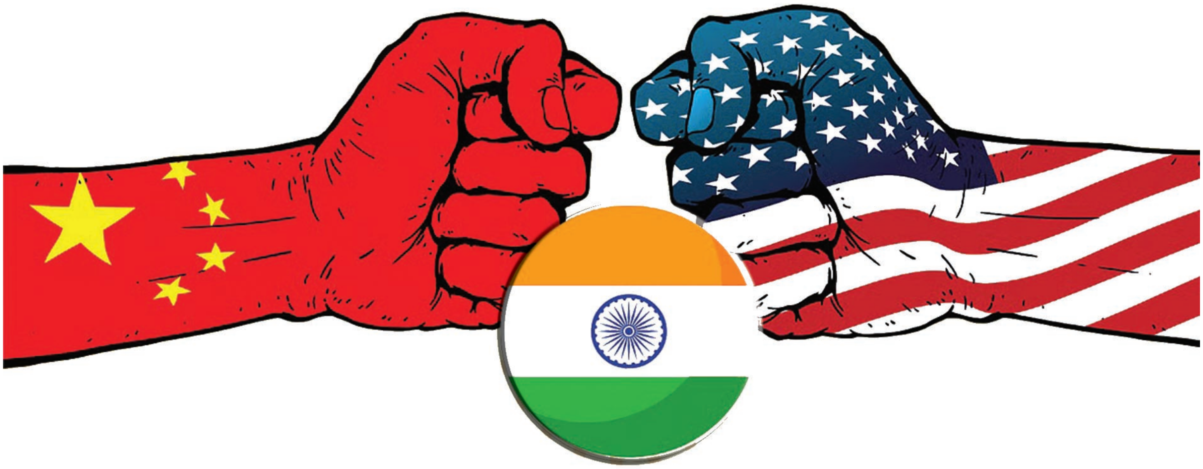

যায়। এটা সূক্ষ্ম ভারসাম্যের খেলা, যেখানে একটা ভুল সম্পূর্ণ ভারসাম্যের অবস্থান বদলে দিতে পারে। এই মুহূর্তে ভারত No Pressure no Surrender নীতি সামনে আনছে যা অর্থনৈতিকভাবে শোষণের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে রয়েছে সব পক্ষের সঙ্গে বিশ্বাস রাখার পরীক্ষা। প্রশ্ন হলো, এই জটিল ভারসাম্য ভারত ভবিষ্যতে ধরে রাখতে পারবে? ভবিষ্যৎ এর উত্তর দেবে। Rubix Data Sciences-এর সমীক্ষা অনুসারে, ২০২৪ সালে আমেরিকার ভারতের সাপেক্ষে বাণিজ্য ঘাটতি ৪৯.৫ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, আমেরিকার মোট বাণিজ্য ঘাটতি ওই বছরে ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার। ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিল ভারত তখন F-16 (এফ-১৬) যুদ্ধবিমান ক্রয় চুক্তি বাতিল করেছিল। এখানেই শেষ নয়, ট্রাম্প শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করার পর ভারতীয় নৌবাহিনী ৩.৬ বিলিয়ন ডলারের ছয়টি পসেইডন এয়ারক্রাফট্ কেনার চুক্তি স্থগিত রাখে। ভারত এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে, আমেরিকা এই শর্ত না মানলে ভারত দেশীয় প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকবে। শুধু ভারত নয়, স্প্যানিশ সরকারও এফ-৩৫ ফাইটার জেট কেনার চুক্তি বাতিল করেছে। পরিবর্তে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছ থেকে বিকল্পের সন্ধান করছে। এর অর্থ হলো, ভারতের দেখাদেখি অন্যান্য দেশও আমেরিকার একতরফা বাণিজ্য নীতি মেনে নেবে না।

ভারত ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে এখন চীনের সমকক্ষ। আমেরিকার গণমাধ্যমগুলি ভারতের সামরিক ক্ষমতা দিয়ে আলোচনা করছে পুলওয়ামা পরবর্তী অপারেশন সিঁদুর নিয়ে। মার্কিন মুলুকে একটি বিষয় জোর চর্চা চলে ডোনাল্ড ট্রাম্প যত না রাজনীতিবিদ তার থেকে ব্যবসায়িক প্রবণতা তার বেশি। ট্রাম্পের নির্বাচনে আমেরিকার তেল কোম্পানিগুলি প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। ট্রাম্প এখন তার প্রতিদান দিতে ব্যস্ত। ভারত তেলের বিরাট বাজার। আমেরিকার তেল সংস্থাগুলি মুনাফার জন্য সেই বাজার ধরতে চায়। ভারতের এত সাহস আমেরিকার কোম্পানিগুলি থেকে তেল না কিনে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে? আমেরিকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থে লাগছে। এ ব্যাপারে আমেরিকার দোসর ন্যাটোও পিছিয়ে নেই। ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুট ভারতকে এই বলে সতর্ক করেছে। ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ না করে তবে ফল বিষময় হবে। ভারতও জানিয়ে দিয়েছে, ভারত অতীতেও কাউকে ভয় পায়নি, ভবিষ্যতেও কাউকে ভয় পায়না। অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারত আমেরিকার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রাজস্থানের পোখরানে পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। ভারতের পক্ষ থেকে এই বিবৃতির পর ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের পায়ের তলার মাটি কেঁপে গিয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর চীন সফর শেষে রাশিয়ায় গেছেন। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চীন সফরে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব অনুসারে দক্ষতাবৃদ্ধি ও শ্রমবিভাজনের কারণে মুক্ত বাণিজ্য সর্বদা লাভজনক। বিগত শতকের শেষ লগ্নে অর্থনীতিবিদ জেমস ব্র্যাণ্ডার ও বারবারা স্পেনসারের গবেষণায় উঠে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়ে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছিলেন একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব, যার নাম— 'ইকোনমিক মডেল ইন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড'। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বাণিজ্যিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলি বিশ্ব-বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে যা অর্থনীতির পরিভাষায় অলিগোপলি (oligopoly) রূপে খ্যাত। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতা অল্প কয়েকজন বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ক্ষেত্রে মার্কেট স্ট্রাকচার বা বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় কখনও শুল্ক বাড়িয়ে বা কমিয়ে। আবার কখনও ভরতুকির মাধ্যমে। আমেরিকা ও চীন এই খেলাই খেলে চলেছে। বিশ্বগুরু ভারত এর অন্তর্বর্তী অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভারসাম্যের খেলার সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ করছে। ■

শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান সমারোহ

'সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল ভারতীয় দর্শনের মধ্যে নিহিত এবং ভারতের শক্তি সংগঠিত হিন্দু সমাজের মধ্যে নিহিত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার এই সিদ্ধান্তেই অটল ও সমর্পিত ছিলেন। তিনি বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যেই রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর ত্যাগ ও তপস্যার প্রভাবেই ভারত আজ বিশ্বগুরুর পথে অগ্রসর।' গত ১০ আগস্ট কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির সভাকক্ষে শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা অয়োজিত ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান সমারোহে কথাগুলি বলেন শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাসের কোষাধ্যক্ষ পূজ্য স্বামী গোবিন্দদেব গিরি মহারাজ। এবছর ৩৬তম প্রজ্ঞা সম্মান তাঁকেই প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সিকিমের মহামহিম রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ মাথুর। প্রধান অতিথি রূপে বিশিষ্ট আয়কর পরামর্শদাতা সজ্জন তুলস্যান এবং বিশেষ অতিথি রূপে ন্যাশনাল লাইব্রেরির মহা নির্দেশক ড. অজয় প্রতাপ সিংহ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তারূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবর সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার টোলির সদস্য মুকুল কানিতকর। অনুষ্ঠানের শুরুতে জনপ্রিয় গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র 'পূর্ণ করেঙ্গে হম সব কেশব, ওহ সাধনা তুমহারি' সংগীত পরিবেশন করেন। মঞ্চস্থ অতিথিগণকে অঙ্গবস্ত্র পরিয়ে বরণ করেন লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, ভাগীরথ চাণ্ডক, অরুণপ্রকাশ মল্লবত, সত্যপ্রকাশ রায় এবং হরিশ তিওয়ারী। বেদ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের সমবেত বৈদিক মন্ত্রোচ্চোরণের সঙ্গে স্বামী গোবিন্দদেব গিরি মহারাজকে তিলক পরান সুশ্রী খুশবু বাজাজ। বিশিষ্ট শিল্পপতি সজন কুমার বনসল মাল্যভূষিত করেন। ড. অজয়প্রতাপ সিংহ শ্রীফল প্রদান করেন। সজ্জল তুলস্যান শাল, মুকুল কানিতকর এবং মহামহিম রাজ্যপাল শ্রীমাথুর তাঁর হাতে মানপত্র এবং ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

স্বাগত ভাষণ দেন কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বাজাজ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডঃ তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কুমারসভা পুস্তকালয়ের সচিব বংশীধর শর্মা। সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন সঞ্জয় মণ্ডল, ভাগীরথ সারস্বত, চন্দ্রকুমার জৈন, রামচন্দ্র অগ্রওয়াল, মনীষ জৈন, কমল কুমার গুপ্তা, অরুণ সিংহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভূমিতে ইতিহাস সংকলন সমিতির আলোচনা সভা

বিভাসচন্দ্র দাস।। বাংলাভাষা ও বাংলাদেশিভাষা নিয়ে যখন দেশজুড়ে বিতর্ক চলছে, তখনই বাংলাভাষার পক্ষে সওয়াল করলেন শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমঘনানন্দজী মহারাজ। গত ৫ আগস্ট দক্ষিণ অসমের শ্রীভূমি সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের অরবিন্দ রায় স্মৃতি মঞ্চে ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির উদ্যোগে 'পঞ্চ পরিবর্তন' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইতিহাস সংকলন সমিতির শ্রীভূমি জেলা সম্পাদক বিপ্লব দেব। সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন রাজ্য সম্পাদক ড. নীলাঞ্জন দে। এরপর 'শ্রীভূমি ইতিহাস বার্তা' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ উন্মোচন করেন উপস্থিত অতিথিগণ। পুস্তকের সম্পাদক প্রদীপ দেব বলেন, এই পুস্তকের মধ্যে জেলার অনেক অজানা ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে জেলার ন'টি খালের ইতিহাস, নাথ বাজারের ইতিহাস প্রভৃতি এই পুস্তকে খুব সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বর্ণনা করে হয়েছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে স্বামী প্রেমঘনানন্দজী মহারাজ বলেন, পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় যখন রাজাদের শাসন ছিল তখনও সেখানে বাংলাভাষার প্রচলন ছিল। বামপন্থীরা রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখলের পরই তাদের ষড়যন্ত্রে তিপ্রা সম্প্রদায়ের লোকেরা 'ককবরক' ভাষা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনে সিপিএমের পরোক্ষ মদত ছিল বলে অভিযোগ করেন স্বামী প্রেমঘনানন্দজী মহারাজ। তিনি বলেন, সমাজের গরিব বা যারা তথাকথিত শিক্ষিত লোক নয় তারাই ভারতের গৌরবময় ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। ভারতীয় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে মহারাজ বলেন, আমাদের পোশাকপরিচ্ছদে সাহেব হলে চলবে না, আচরণে ভারতীয় হতে হবে। ধর্ম ভারতের প্রাণ। ধর্মকে বাদ দিয়ে কখনোই উন্নত ভারতের কল্পনা করা যাবে না।

পঞ্চ পরিবর্তন বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ অসম প্রান্ত প্রচারক গৌরাঙ্গ রায় বলেন, যারা একসময় নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতেন তারাই আজকের দিনে অযোধ্যা, অমরনাথ, কুম্ভমেলা প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সেলফি উঠিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করছেন। বর্তমানে দেশজুড়ে পরিবর্তন এসেছে। এখন সবাই বুঝতে পারছে হিন্দুত্বই ভারতের প্রাণ। হিন্দুত্বের ভিত্তিতেই সমাজে পরিবর্তন আনতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের দ্বারাই ভারতকে বিশ্বগুরুর আসনে বসাতে হবে। ভারতীয় ইতিহাসকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পশ্চিমি মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে।

ছেলে-মেয়েদের ছোটোবেলা থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রান্ত প্রচারক বলেন, বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা নিজের মাতৃভাষায় পড়তে লিখতে অপারগ। তিনি উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ ভারতে জন্ম নিলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইংরেজ হয়ে গেছে। বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক নর্মদা চক্রবর্তী, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশনরঞ্জন দাস, নন্দিতা দাস, সৌমিত্র পাল, সুব্রত চৌধুরী, অরবিন্দ পাল, সুবীর বরণ রায়, মলয়কান্তি চৌধুরী প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন কৃষ্ণা মেনন দে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সদস্য বিশ্বদীপ দাস।

সমাজসেবা ভারতীর উদ্যোগে ঝুলনযাত্রা উৎসব

সমাজসেবা ভারতী মেদিনীপুর বিভাগের উদ্যোগে গত ৯ আগস্ট কলাইকুণ্ডা হরেকৃষ্ণ কাঁটায় ঝুলনযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

উৎসবে অংশগ্রহণ করেন খড়্গপুর আইআইটি-র প্রাক্তন নির্দেশক ড. বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিমল কুমার

রাজ, সমাজসেবা ভারতীর মেদিনীপুর বিভাগ সম্পাদক আইনজীবী শুভা রাজ-সহ বহু গণ্যমান্য মানুষ। উল্লেখ্য, সমাজসেবা ভারতী মেদিনীপুর বিভাগের পরিচালনায় এলাকায় পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের জন্য ৩০টি সংস্কারকেন্দ্র চলছে। প্রতিটিতে ২৫ জন ছেলে-মেয়ে রয়েছে। শ্রীমতী শুভা রাজ জানান তাঁরা এলাকারই একজন মেয়েকে শিক্ষিকা হিসেবে তৈরি করেন। তার পক্ষে এলাকার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। তিনি জানান, সমাজে নারীর ক্ষমতায়ণ ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করে চলেছেন। সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ এবং যোগ প্রশিক্ষণ দিয়ে মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে ১০টি গ্রামের ১৩০০ মহিলাকে স্বনির্ভর করা হয়েছে। খড়্গপুর শহরে মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং এবং পাম্প রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। আগামীতে সংস্কার কেন্দ্রের সংখ্যা ৫০ করার তাঁদের লক্ষ্য রয়েছে। উৎসবে ৩০টি সংস্কার কেন্দ্রের ছেলে-মেয়ে একত্রিত হয়ে দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি, নাচ পরিবেশন করে। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা ভারতী মেদিনীপুর বিভাগের সভাপতি তথা একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অভিষেক কুমার যাদব। তিনি বলেন, বৃক্ষরোপণ, জৈবচাষে জোর এবং জল সংরক্ষণে সমাজসেবা ভারতী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বিপ্লবী, দেশনেত্রী লীলা রায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৯ আগস্ট 'দেশনেত্রী ১২৫তম জন্মোৎসব কমিটি'র পরিচালনায় মধ্য কলকাতা-স্থিত লীলা রায় মঞ্চে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় দেশনেত্রী লীলা রায় (নাগ)-এর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নেতাজী গবেষক ডাঃ মধুসূদন পাল, বিশিষ্ট সাংবাদিক ড. জয়ন্ত চৌধুরী এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী ডলি রায়। রাখিবন্ধনের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ মধুসূদন পাল। এছাড়াও বিপ্লবী, দেশনেত্রী লীলা রায়ের বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন ড. জয়ন্ত চৌধুরী। তাঁরা বলেন যে, ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন লীলাবতী নাগ। তাঁর পিতা হলেন তৎকালীন অসমের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গিরীশচন্দ্র নাগ।

মা— কুঞ্জলতা নাগ। বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে সর্বোচ্চ নম্বর-সহ স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। পেয়েছিলেন পদ্মাবতী স্বর্ণপদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন তিনি। লাভ করেছিলেন কলা বিভাগের স্নাতকোত্তর বা এম.এ. ডিগ্রি। কালক্রমে যুক্ত হয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসঙ্ঘে। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এশিয়ার বুকে মহিলাদের প্রথম সংগঠন 'দীপালী সঙ্ঘ'। শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছিলেন একাধিক স্কুল। তাঁর অনুপ্রেরণায় ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী-সহ অনেক মহীয়সী বঙ্গনারী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদকে পাথেয় করে তিনি সম্পাদনা করেন 'জয়শ্রী' পত্রিকা। বিপ্লবী, দার্শনিক অনিলচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সাংগঠনিক জীবনে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আশীর্বাদধন্যা বিপ্লবী, দেশনেত্রী লীলা রায় ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সদস্যা হয়েছিলেন। 'ফরওয়ার্ড' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বও লীলা রায়কে দিয়েছিলেন নেতাজী। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। কলকাতা ও নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ নেমে এলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ত্রাণ ও সেবাকাজে। স্বাধীনতার পর বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য জমি-সহ তাঁদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দাবিতে গড়ে তুলেছেন একের পর এক জন-আন্দোলন। ১৯৭০ সালের ১১ জুন প্রয়াত হন দেশনেত্রী। ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁর আত্মত্যাগ, স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অবদান স্মরণের গুরুত্বের বিষয়টি তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করেন ডলি রায়। অনুষ্ঠানে বিদ্যা ভারতী গার্লস্ হাই স্কুলের শিক্ষিকাদের হাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রচিত এবং জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল্' বইটি-সহ আরও অনেকগুলি বই তুলে দেন ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত।

ফঃ ৪

‘ত্র্যম্বকম’ পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাবেশ

গত ১০ আগস্ট ত্র্যম্বকম সাহিত্য পরিবার, বিশ্ববাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ, বিবেকবাহিনী ব্রতচারী সখা এবং প্রাণকৃষ্ণ পাণ্ডে মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় মধ্য কলকাতা-স্থিত বিপ্লবী নলিনী গুহ সভাঘরে আয়োজিত হয় ‘ত্র্যম্বকম’ ষাণ্মাসিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকার শিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির মিনিস্টার ইন-চার্জ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ঈশাত্মানন্দজী মহারাজের নামকরণে সমৃদ্ধ ও আশীর্বাদধন্য ত্র্যম্বকম সাহিত্য পত্রিকার এই মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এদিন সংঘটিত হয় একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাবেশ। সঞ্জয় বসুর কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ‘ও আমার দেশের মাটি’ গানটি গেয়ে শোনান তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্র্যম্বকম পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং শিক্ষক, সমাজকর্মী ও সাহিত্যিক রবীন পাণ্ডে, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও নির্দেশক অনুপ পান, বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. সুভাষ রায় ও তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কবি সুমিত্রা পাল ও উত্তম চক্রবর্তী, আনন্দ প্রকাশনের প্রকাশক নিগমানন্দ মণ্ডল, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাতবউ মঞ্জু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজন। টাঁড়বাঙ্গলা অঞ্চলের স্থানীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, ভাদ্র ও পৌষ মাসে ভাদু-টুসু গান এবং জাওয়া উৎসবের মতো লোকসংস্কৃতিগত বিষয়গুলি বক্তাদের বক্তব্যে এদিন উপস্থাপিত হয়। তাঁদের বক্তব্যের পর উন্মোচিত হয় পত্রিকার মোড়ক এবং আত্মপ্রকাশ করে ত্র্যম্বকম সাহিত্য পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বা আগস্ট ২০২৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩২ সংখ্যা। এরপর হয় বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান। সুমিত্রা পাল রচিত ‘ছড়ায় ছড়ায় হাসিখুশির দেশে’ এবং টাঁড়বাঙ্গলা অঞ্চলের আঞ্চলিক বাংলাভাষায় বাসুদেব কর্মকার রচিত ‘ও টুসু শুন ক্যানে’ বই দু’টি এদিন প্রকাশিত হয়। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের আবহসংগীতের মধ্য দিয়ে একটি কবিতা আলেখ্য পরিবেশন করেন ড. অরুণাংশু দাশ। অনেকেই তাঁদের স্বরচিত কবিতাপাঠ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও কবি বাসুদেব কর্মকার।

মালদহে বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের রক্তদান শিবির

গত ১১ আগস্ট মালদহ জেলার বাচামারী গভঃ কলোনীস্থিত বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে ভারতমাতার বীর সন্তান হুতাত্মা ক্ষুদিরাম বসুর বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে দ্বাদশতম রক্তদান শিবিরের অয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে শিবিরের উদ্বোধন করেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ডাঃ পার্থ দাস। উপস্থিত ছিলেন মালদা কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের আধিকারিক ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটালের প্রতিনিধি দল, শিশু মন্দিরের সভাপতি, সম্পাদক, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা। শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য পঙ্কজ কুমার সরকার এদিনের তাৎপর্য বর্ণনা করেন এবং ১১ থেকে ১৮ আগস্ট সপরিবারে স্বদেশী সপ্তাহ এবং সংস্কৃত সপ্তাহ পালনের জন্য আগ্রহ করেন। শিশু মন্দিরের সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ-সহ অভিভাবক-অভিভাবিকা, আচার্য-আচার্যা, প্রাক্তন বিদ্যার্থী-সহ মোট ৩৯ জন রক্ত দান করেন। শিশু মন্দিরের সভাপতি অম্লান গঙ্গোপাধ্যায় সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের স্বদেশী সুরক্ষা ও স্বাবলম্বন অভিযান

গত ৭ থেকে ১০ আগস্ট স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী স্বদেশী সুরক্ষা ও স্বাবলম্বন অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে বিদেশি কোম্পানিগুলিকে ভারত ছাড়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জনসভা ও পথসভায় বিদেশি পণ্য বয়কটের জন্য সাধারণ মানুষেক কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন সকলে স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করেন। ৮ আগস্ট সন্ধ্যায় কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। ৯ আগস্ট বিধান সরণি শ্রীমানি মার্কেটের পাশে রাখিবন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। সেখানে বিদেশি বয়কট এবং স্বদেশি গ্রহণের শপথ গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল এবং স্বস্তিকার পত্রিকার সাংবাদিক অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের মহানগরের কার্যকর্তারা। এই কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলায় ৩৭টি স্থানে পালন করা হয়। এর মধ্যে শুধু পূর্ব মেদিনীপুরেই ১২টি কর্মসূচি পালিত হয়। পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরেও বড়ো কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে রবীন্দ্র-শৈলজা স্মরণ অনুষ্ঠান

গত ৯ আগস্ট মৌলানা আবুল কালম আজাদ ইন্সটিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের (সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার) সহযোগিতায়, ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস ও সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ-এর যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার আইসিসিআর-এর সত্যজিৎ রায় সভাগৃহে আয়োজিত হলো 'বাইশে শ্রাবণ' এবং সংগীতাচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, মৌলানা আবুল কালম আজাদ ইন্সটিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপিকা বিদিশা সিনহা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাসের অছি সুভাষ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন সংস্কার ভারতীর প্রান্ত সভাপতি তথা মৌলানা আবুল কালম আজাদ ইন্সটিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ড. সরূপ প্রসাদ ঘোষ। হাতে রাখি পরিয়ে দেন মহাশ্বেতা চক্রবর্তী। উপহার তুলে দেন গোপাল কুণ্ডু। ক্যালেন্ডার তুলে দেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। সংস্কার ভারতীর ৬০ জন শিল্পীর সমবেত সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। পরিচালনায় ছিলেন তনুশ্রী মল্লিক ও অনিমা দাস। এদিন সংগীতের মাধ্যমে সঙ্গীতাচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়।

পরিবেশনায় ছিলনে সর্বাণী চক্রবর্তী ও সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ-এর শিল্পীবৃন্দ।

বড়োবাজার লাইব্রেরিতে স্বস্তিকা (হিন্দি) পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ১৩ আগস্ট স্বস্তিকা পত্রিকার পক্ষ থেকে মধ্য কলকাতা-স্থিত বড়োবাজার লাইব্রেরির আচার্য ড. বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী সভাঘরে আয়োজিত হয় 'স্বস্তিকা (হিন্দি মাসিক) পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ-প্রথম সংস্করণ প্রকাশ অনুষ্ঠান। সমবেত গীতের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর সভায় উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিরা তাঁদের আসন গ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী মহাবীর প্রসাদ বজাজ। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী অজিত জানা। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী সুনীল সিংহ। প্রধান বক্তা ছিলেন স্বস্তিকা (হিন্দি মাসিক) পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে। এরপর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং স্বস্তিবাচনের মধ্য দিয়ে অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন করেন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

সভায় স্বাগত ভাষণদান করেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা। তিনি বলেন যে, ১৯৪৮ সাল থেকে বাংলাভাষায় প্রকাশিত স্বস্তিকা সাপ্তাহিক পত্রিকা এই বছর ৭৮-তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এতগুলি বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বুকে রাষ্ট্রবাদী চিন্তা-চেতনার প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত থেকেছে স্বস্তিকা। সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেই হিন্দি ভাষায় সংবাদ পরিবেশন, সাহিত্য রচনা-সহ রাষ্ট্রবাদী বিমর্শ নির্মাণে এই মাসিক পত্রিকাটি আগামীদিনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়াশীল থাকবে। এরপর হয় স্বস্তিকা (হিন্দি মাসিক) পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। সভায় উপস্থিত রাষ্ট্রবাদী ভাবধারার লেখক, পাঠক ও সাহিত্যপ্রেমীদের সামনে সম্মানীয় অতিথিরা পত্রিকাটির আবরণ উন্মোচন করেন। প্রথম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা বা ১৫ আগস্ট, ২০২৫ সংখ্যাটি সভায় উপস্থিত সকলের হাতে এদিন তুলে দেওয়া হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন শ্রী সুনীল সিংহ এবং শ্রী অজিত জানা। এরপর একটি একক গীত পরিবেশন করেন শ্রী অমিত পটোয়া। এরপর বক্তব্য রাখেন এদিনের সভার প্রধান বক্তা ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে। তিনি বলেন যে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— এই চারটি বিষয় লাভই হলো মানবজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা পুরুষার্থ। সম্যকভাবে সেই বিষয়গুলি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিরন্তর অগ্রসর হওয়াই হলো মানবজীবনের সাধনা। কিন্তু পুরুষার্থ লাভের পথে যখন নানা বাধাবিঘ্ন আসে, বিশেষত ধর্ম যখন গ্লানির সম্মুখীন হয়, তখন মানুষ দিশাহীন হয়ে পড়ে, অধর্মের পথে পরিচালিত হয়। সেই সময় মানুষের জীবনকে সঠিক দিশা দেখানোর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও বিমর্শের। আর সেই লক্ষ্যেই অবিচল থেকে দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে যাত্রা শুরু করেছে স্বস্তিকা (হিন্দি মাসিক) পত্রিকা। প্রধান বক্তার বক্তব্যের পর স্বস্তিকার মুখ্য ব্যবস্থাপক শ্রী জয়রাম মণ্ডল সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান যে, প্রতি মাসে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে। এর বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হলো— ৩৫০ টাকা। এরপর সভাপতি হিসেবে ভাষণদান করেন শ্রী মহাবীর প্রসাদ বজাজ। রাষ্ট্রবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই পত্রিকাটি কাজ করবে বলে তিনি জানান। সেই আদর্শকে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের বুকে চিরস্থায়ী করার প্রয়াসকে জারি রাখার জন্য সকলের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন। সভার শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন স্বস্তিকার অন্যতম নির্দেশক শ্রী অরিন্দম সিংহরায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রী বিকাশ সিংহ। কল্যাণ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মনসা পূজা ও রাঢ় অঞ্চল

প্রবীর কুমার রায়

নাগেদের অর্থাৎ সাপের দেবী হিসেবে মনসা পূজা বরেন্দ্রভূমিতে আষাঢ়ের নাগপঞ্চমীতে শুরু হয় ও শ্রাবণ মাস ছাপিয়ে ভাদ্র মাসে তার সমাপ্তি ঘটে। পুরাণে মা মনসার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে মনসা, ঋষি কাশ্যপ ও নাগ মাতা কদ্রু কন্যা। কিন্তু পুরাণে মনসা অনেকটা ব্রাত্য। দেবী হিসেবে পূজা পাননি। আমরা এখন যে মনসা দেবী দেখি তার সৃষ্টি ১৪০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতাদের হাত ধরে। এখানে মনসা শিব কন্যা, বাসুকি নাগের ভগিনী, জরৎকারু মুনির স্ত্রী ও আস্তিক মুনির মা। এখানে মনসা বণিক চাঁদ সওদাগরের হাতে পূজিতা ও সমগ্র বরেন্দ্রভূমিতে সমাদৃতা।

এতো গেল বরেন্দ্র বঙ্গের কথা যার একটা বড়ো অংশ অধুনা বাংলাদেশ। মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতারা প্রায় সকলেই বরেন্দ্র ভূমির। কিন্তু আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মনসা পূজার সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের সম্পর্ক। রাঢ় অঞ্চল বলতে বোঝায় বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ, ঝাড়গ্রাম-সহ সমগ্র পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, সাবেক পুরুলিয়া জেলা ও বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন অঞ্চল সমূহ। রাঢ় অঞ্চলে মনসা দেবী হচ্ছেন ঘরের কন্যা। এখানে দেবী উর্বরতা ও প্রজননের প্রতীক। এই অঞ্চল ছোটো ছোটো পাহাড়, টিলা, জঙ্গল, লেক, পাহাড়ি ধরনা দিয়ে সাজানো প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্প ভীতি। তাই একমাত্র শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই রাঢ় অঞ্চলে মহা ধুমধাম সহকারে মনসা পূজা হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে বসবাস করেন কুর্মি সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ শবর, বাউরি, ভুমিজ, মুদি, কোরা, সাঁওতাল, কুমোর, তামবুলি ও সরাক সম্প্রদায়। আর আছে অল্পসংখ্যক মৈথিলী, বরেন্দ্র ও উৎকল ব্রাহ্মণ। উৎকল ব্রাহ্মণদের পদবী হচ্ছে দাস, পাত্র, দেওঘরিয়া, বেলথরিয়া ইত্যাদি।

কালক্রমে স্থানীয় সামন্ত রাজা, জমিদারদের হাত ধরে মনসা পূজা এইসব অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। শহর-গ্রাম সর্বত্রই আড়ম্বরের সঙ্গে মনসা পূজা হয়ে থাকে। তবে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে উন্মাদনা বেশি দেখা যায়। এই পূজাকে কেন্দ্র করে নতুন জামা কাপড় কেনার চল আছে। উন্মাদনায় টুসুর পরেই এই পূজার স্থান। এই পূজা মূলত গৃহস্থের বাড়ি ভিত্তিক ও কোথাও কোথাও ক্লাবভিত্তিক হয়ে থাকে। পূজার উপকরণে যেখানে যে জিনিস পাওয়া যায় সে দিয়েই হয়ে থাকে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এখানকার মনসা পূজাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বাধ্যতামূলক নয়। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী পূজারি হতে পারেন। এই পুরোহিতকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'দেহুরি'। তবে তিনি পূজা করবেন বা ঘট ভরার জন্য পুকুরে, নদীতে বা ঝরনায় জল আনতে যাবেন তাদের নতুন বা শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ও উপবাস থাকা বাধ্যতামূলক। আর পূজার মন্ত্র মূলত স্থানীয় ভাষার সুরে মনসামঙ্গলের পাঁচালী। এই পূজার আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বলি প্রথা, যা বাধ্যতামূলক। মূলত হাঁস বলি হয়ে থাকে। এছাড়াও অর্থবান গৃহস্থের বাড়িতে অথবা দেবতার কাছে মানত থাকলে ভেড়া, পাঠাও বলি হয়ে থাকে। তবে পাঠা থেকে ভেড়া বলির প্রচলন বেশি। রাঢ় অঞ্চলে মনসা পূজা আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পান্না ব্রত।

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে সূর্যাস্তের পর রাত্রে মনসা পূজা হয়ে থাকে। পূজা সমাপনে হবে বলিদান। বলির শুরুতে অবশ্যই থাকবে আখ, চাল কুমড়ো বলি। তারপর পশু বলি। পরের দিন এই রান্না করা মাংস খেয়ে ব্রত বা উপবাস ভাঙা বাধ্যতামূলক। এই প্রথাকে বলা হয় পান্না। এই কাজটি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়।

সাধারণত সংক্রান্তির দিন দুপুর দুটোর পরে অফিস কাছারি ফাঁকা হতে থাকে ও পরের দিন অফিসে উপস্থিতির হার নাই বললেই চলে। বিকাল থেকেই বেসরকারি যানবাহন চলাচল বন্ধ হতে থাকে ও পরের দিন বেশিরভাগ বেসরকারি যান চলে না, দোকান, হোটেল খোলা থাকে না। কর্মচারীদের পূর্ণ ছুটি। এর কারণ হচ্ছে আরাম করে দেবীর কাছে উৎসর্গকৃত মাংস ভক্ষণ। যাতে সাপের কামড়ানো থেকে মা রক্ষা করেন।

লক্ষ্য করুন বিদ্যার দেবী সরস্বতীর মতোই মা মনসার বাহন হচ্ছে হাঁস। অথচ মনসা পূজার রাত্রে হাজার হাজার হাঁস বলি হয়ে থাকে। আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওইসব পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় হাঁস চাষ হয় না। পুরো হাঁস রপ্তানি হয় উত্তরবঙ্গ থেকে। বিশেষ করে মালদার গাজোল, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দিনাজপুর জেলা থেকে। পাঁঠা, ভেড়া স্থানীয়। এসব অঞ্চলে আগে অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই দুর্বল তাই হয়তো পাঁঠা বা ভেড়ার পরিবর্তে ব্যাপক হারে হাঁস বলি দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী তথা পলিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও কোথাও হাঁস বলি দেখা যায়। তবে বর্তমানে মনসা পূজা বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চলে সার্বজনীন উৎসবের রূপ নিয়েছে। □

তারকেশ্বরের শ্রাবণীমেলা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

নিমাইতীর্থ ঘাট

বয়স তখন চব্বিশ। ভরা যৌবন। ওই বয়সেই সন্ন্যাস নিলেন তিনি। নিমাই থেকে হলেন শ্রীচৈতন্য। এসব ষোড়শ শতকের একবারে গোড়ার কথা। জন্মভূমি নবদ্বীপ ছেড়ে সাময়িকভাবে রয়েছেন শান্তিপুরে। ইচ্ছা বৃন্দাবনবাসী হওয়ার। কিন্তু মায়ের কথায় জায়গা বদল। বৃন্দাবনের পরিবর্তে শ্রীক্ষেত্র নীলাচল। গঙ্গা বেয়ে যাত্রার পথে শ্রীচৈতন্য থামলেন হুগলির বৈদ্যবাটিতে।

বৈদ্যবাটিতে যে ঘাটে শ্রীচৈতন্য নেমেছিলেন, স্নান-আহ্নিক-পূজা করেছিলেন, তাঁরই নামে সে ঘাটের আজ পরিচিতি নিমাইতীর্থের ঘাট হিসেবে। সেখান থেকে আবার শুরু হয় তাঁর যাত্রা নৌকায়।

কেউ কেউ মনে করেন, বৈদ্যবাটি ওই ঘাট থেকে শ্রীচৈতন্য গিয়েছিলেন তারকেশ্বরে। পদব্রজে। সময় লেগেছিল ১২ ঘণ্টা। এতো শোনার পরও বলতে হয়, তথ্যটা সম্ভবত কেন, নিশ্চিতভাবেই ভুল। তার প্রধান কারণ পাঁচশো বছ আগে তারকেশ্বরে অনাদি লিঙ্গ তারকনাথ বিরজিত থাকলেও মন্দিরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যর যাত্রাপথের নির্ভরযোগ্য যেমন তথ্য পাওয়া যায় তার কোনোখানেই তাঁর তারকেশ্বর তীর্থদর্শনের কথা নেই। তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যর তারকেশ্বরে যাওয়ার যে কথা বলেন কেউ কেউ তার মূলে রয়েছে হয়তো কিছু ভ্রান্তি।

তারকনাথের মাথায় গঙ্গাজল ঢালার জন্য যেমন পুণ্যার্থী পদব্রজে বাঁকে অথবা ঘটে জল নিয়ে যান, তাঁদের বেশিরভাগ ওই জল সংগ্রহ করেন বৈদ্যবাটী ওই নিমাইতীর্থের ঘাট থেকে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই তীর্থযাত্রীরা এইভাবে গঙ্গাজল নিয়ে যান তারকেশ্বরে। এর মধ্যে শিবরাত্রি, গাজন, বৈশাখী পূর্ণিমা এবং শ্রাবণ মাসেই জলযাত্রী বা বাঁকযাত্রীদের ভিড় হয় বেশি। শিবরাত্রি গাজন এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় জলযাত্রীদের প্রায় সকলেই একসময় ছিলেন বাঙ্গালি। আর শ্রাবণ মাসটা ছিল অবাঙ্গালিদের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু এখন সে ভেদাভেদ প্রায় নেই বললেই চলে। বাঙ্গালি অবাঙ্গালি নির্বিশেষে সকলেই এই যোগগুলিতে তো বটেই, প্রায় সারা বছরই জলযাত্রী হিসেবে গঙ্গাজল নিয়ে পায়ে হেঁটে যান তারকেশ্বরে।

এই প্রসঙ্গেই বলতে হয়, গত পাঁচ ছয়ের দশকেও তারকনাথের নিত্যপূজার জন্য তারকেশ্বর মঠের পক্ষ থেকে গোরুর গাড়ি করে জল আনার ব্যবস্থা ছিল। সেই জলও সংগ্রহ করা হতো নিমাইতীর্থের ঘাট থেকেই। বৈদ্যনাথ ধামের বৈদ্যনাথের মাথায় ঢালার জন্য যেমন সুলতানগঞ্জ বা অজগৈবিনাথ থেকে গঙ্গার জল সংগ্রহ করা হয়, তারকেশ্বরের ক্ষেত্রেও সেইভাবেই জড়িয়ে আছে নিমাইতীর্থ ঘাটের নাম। সম্ভবত এসব কারণেই কেউ কেউ শ্রীচৈতন্যর তারকেশ্বরে আসার কথা বলে থাকেন।

আবিষ্কারক গোয়ালা মুকুন্দ

তারকেশ্বরের তারকনাথ স্বয়ম্ভু— অনাদি লিঙ্গ শিব। এখানে প্রথম মন্দিরের নির্মাণকাল সঠিক ভাবে জানা যায়নি প্রয়োজনীয় নথির অভাবে। পারিপার্শ্বিক তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ শেষেও মন্দির নির্মাণের সময় সপ্তদশ শতকের আগে আনা যায় না। অর্থাৎ তারকেশ্বর মন্দিরের বয়স খুব বেশি হলেও সাড়ে তিনশো বছর ছাড়াচ্ছে না কোনো ভাবেই। স্বভাবতই শ্রীচৈতন্যর তারকেশ্বর আসার কথাটা একবারেই জনশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

থাক সে কথা। আসা যাক তারকেশ্বর মন্দিরের প্রধান উৎসবগুলির কথায় বঙ্গে কিছুটা ব্যতিক্রমী হলেও বর্তমানে এখনকার অন্যতম প্রধান উৎসব শ্রাবণী মেলা। মাসভর এই মেলায় এখন আসেন লক্ষেরও বেশি মানুষ। তবে শিবরাত্রি বা গাজনের মতো প্রাচীন নয় এই মেলা। মাত্রই শতাব্দী পেরিয়েছে এই মেলার বয়স।

মন্দিরের ইতিহাস-কথা থেকে জানা যায়, এই শিবলিঙ্গের আবিষ্কারক তারকেশ্বরের অদূরবর্তী

রামনগরের ভূস্বামী রাও ভায়ামল্লের গোরক্ষক মুকুন্দ ঘোষ। তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে রাও ভায়ামল্ল ওই শিবলিঙ্গ তুলে নিয়ে রামনগরে প্রতিষ্ঠা করতে চান। তার জন্য শুরু হয় খোঁড়াখুঁড়িও। পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে ভায়ামল্ল তারকেশ্বরেই ওই শিলার ওপর মন্দির তৈরি করে দেন। তারপরই বাবা তারকনাথের মহিমার কথা ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারিদিকে। কিন্তু সেসময় যোগাযোগব্যবস্থা এখনকার মতো উন্নত না হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন তীর্থের মতোই তারকেশ্বরেও ভক্ত, পুণ্যার্থীদের সংখ্যা ছিল মোটামুটি সীমিত। ফলে মন্দিরের আয়ও ছিল যথেষ্ট কম।

তখন মন্দিরের নিত্যপূজা ও অন্যান্য কাজ নির্বাহের মূল উৎস ছিল রাও ভায়ামল্ল প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি। তারকেশ্বরের গিরি-মোহান্তদের একটি ধারা ব্যবসায়ী হওয়ার পরেই তাঁরা জমিদারদের মতো সম্পত্তি করার দিকে নজর দিতে থাকেন। ফলে মোহান্তদের ক্রমে জমিদারদের ভূমিকায় দেখা যেতে থাকে।

মোহান্তরা যেন জমিদার

জমিদারি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাভাবে মন্দিরের আয় বাড়াতে সচেষ্ট হন মোহান্তরা। দেশে রেল চলাচল শুরু হওয়ার পর সারাদেশেও তীর্থযাত্রায় আসে জোয়ার। বঙ্গদেশে রেল চলাচল শুরু হয় ১৮৫৪-র ১৫ আগস্ট। আর তারই একত্রিশ বছর বাদে ১৮৮৫-র পয়লা জানুয়ারি শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ লাইন চালু হয়। এই রেললাইনের মালিক ছিল তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানি। পরবর্তীকালে এটির মালিক হয় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি বা ইআইআর।

তারকেশ্বর পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের সময় তারকেশ্বরের মোহান্ত ছিলেন মাধবচন্দ্র গিরি। সেই সময় থেকেই তারকেশ্বরে তীর্থযাত্রী আসার সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে বৃদ্ধি পেতে থাকে মন্দিরের আয়তন। কিন্তু মোহান্ত মাধব গিরি নানা অনৈতিক কাজে যুক্ত থাকার কারণে কারারুদ্ধ হওয়ার পর পুণ্যার্থীর সংখ্যায় আসে ভাটার টান।

মাধব গিরির পর তারকেশ্বরে গিরি সম্প্রদায়ের শেষ মোহান্ত হন সতীশচন্দ্র গিরি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। মোহান্ত হয়ে সতীশচন্দ্র গিরি নানা ভাবে তারকেশ্বর তীর্থের মহিমা প্রচার এবং মন্দিরের আয় বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। তিনি কলকাতার অভিজাত মহলের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে থাকেন। তারকেশ্বর রাস্তাঘাট ইত্যাদি উন্নত করার দিকেও নজর দেন তিনি। একই সঙ্গে তারকেশ্বর মন্দির সন্নিহিত এলাকায় প্রজাদের ওপর চাঁদনি স্বত্ব নামে এক ধরনের খাজনা ব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থায় প্রজাদের যথেষ্ট উচ্চহারে খাজনা দিতে হতো। একই সঙ্গে প্রজাদের পাকাবাড়ি তৈরির অধিকার ছিল না। এই ব্যবস্থায় তারকেশ্বর এস্টেটের আয় বাড়লেও প্রজাদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ দেখা দেয়। তবে মোহান্ত সতীশ গিরি সেই অসন্তোষকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো করেই মন্দির ও জমিদারি পরিচালনা করতে থাকেন।

শ্রাবণে মাড়োয়ারি মেলা

এই প্রসঙ্গেই বলতে হয়, তারকেশ্বরের গিরি মোহান্তরা ছিলেন অবাঙ্গালি। সেই কারণে তাঁরা বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিহার- উত্তরপ্রদেশের সংস্কৃতির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সেই ধারাতেই মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরি বঙ্গদেশের অবাঙ্গালিদের তারকেশ্বরমুখী করার জন্য একটি পরিকল্পনা নেন।

বর্তমান ঝাড়খণ্ডের বৈদ্যনাথ ধামে শ্রাবণ মাসে যে কাঁওর যাত্রা হয় তারই অনুকরণে তিনি তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলার প্রবর্তন করেন। আষাঢ়ের গুরুপূর্ণিমা থেকে শ্রাবণের ঝুলন পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে এই শ্রাবণী মেলা। তবে মাসজুড়ে নয়, মেলা বসত প্রতি সোমবার। এই মেলার সঙ্গে

বঙ্গদেশে প্রচলিত মেলার কোনো মিল ছিল না। এক্ষেত্রে বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত কাঁওর যাত্রার ওপরই জোর দেন তিনি। তাঁর আহ্বানেই কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবাঙ্গালিরা সোমবার-সোমবার বাঁকে করে গঙ্গাজল এনে তারকনাথের মাথায় ঢালা শুরু করেন।

শ্রাবণ মাসে এই ভাবে কাঁওর যাত্রার যে প্রচলন তিনি করেন স্থানীয়ভাবে তা মাড়োয়ারি মেলা হিসেবে পরিচিতি পায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত শ্রাবণ মাসে গঙ্গাজল নিয়ে পদযাত্রায় বাঙ্গালিরা তেমনভাবে যোগ দিতেন না। তবে এই দিনগুলিতে ফিরতি পথে ট্রেনে যে ভিড় হতো তা সামাল দিতে প্রথম থেকেই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ট্রেন চালাবার ব্যবস্থা করে আসছেন।

অন্যদিকে সতীশ গিরির উদ্যোগেই সে সময়ে তারকেশ্বরে ধর্মশালাও নির্মাণ করেন অবাঙ্গালি ব্যবসায়ীরা। একই সঙ্গে হনুমান পরিষদ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানও মূলত অবাঙ্গালি তীর্থযাত্রীদের থাকা এবং অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করার সক্রিয় হয়।

এই শ্রাবণী বা মাড়োয়ারি মেলা প্রবর্তনের ফলে তারকেশ্বর মন্দিরের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তারকেশ্বরের নানা উন্নয়ন কাজেও ক্রমে অবাঙ্গালি ধনী সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে যুক্ত হতে থাকেন। একই সঙ্গে স্থানীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কম-বেশি উন্নতির একটা প্রদীপ টিপটিপ করে জ্বলতে থাকে। তবে রুচি ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে এক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চেয়েও কলকাতা থেকে আসা ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী খাবারের দোকানদাররা বেশি লাভবান হতে থাকেন। এখন অবশ্য সেই ব্যবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। বলা যায় এক্ষেত্রে তারকেশ্বরে স্থায়ীভাবেই কিছু অবাঙ্গালি ব্যবসা শুরু করার আগের মতো অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের আসাটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

মেলার রূপ রূপান্তর

বিশ শতকের গোড়ায় তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা প্রবর্তন করেন তৎকালীন মোহান্ত সতীশ গিরি। লক্ষ্য ছিল অবাঙ্গালি ভক্তদের ভিড় বাড়ানো। তিনি চেয়েছিলেন আয় বাড়াতে সেই সঙ্গে স্থানীয়দের অর্থনৈতিক উন্নতি।

স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর পর পর্যন্ত বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর পথটি ছিল বেশ দুর্গম। কাঁচা ও মাটির রাস্তা। মাঝে মাঝে শুনশান। রাতে একবারে অন্ধকার। এরকম রাস্তা ধরে জল নিয়ে যাওয়া সত্যিই এক সাধনা। ভক্তি ও বিশ্বাসে সে সাধনায় উত্তীর্ণ ভক্তের দল ভিড় বাড়াতে থাকে তারকেশ্বরে। ভরে উঠতে থাকে প্রণামীর বাক্স।

যাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকায় স্থানীয়দের অবস্থাও ভালো হতে থাকে। তারকনাথের পূজায় নিবেদন করা হতো এক বিশেষ ধরনের চিনির মিষ্টি— নাম যার 'ওলা'। চিনিতে সামান্য জল দিয়ে মেখে নাড়ুর মতো গোল গোল এবং আতা সন্দেশের ছাঁচে ফেলে তৈরি ওই মিষ্টি রোদে শুকনোর পর হতো তা প্রায় বজ্রকঠিন। দাঁত দিয়ে চেপে অথবা শক্ত কিছুর বাড়ি দিয়ে ভাঙতে হতো তা। এগুলি তৈরি করতেন মন্দিরপাড়ার দোকানদার এবং তাঁদের বাড়ির মেয়েরা অবসর সময়ে। তা ছিল তারকেশ্বরের এক উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প। কিন্তু গত ছয়ের দশকে চিনির আকালের সময় বিলুপ্তি ঘটে এই শিল্পের।

বর্তমানে উত্তর ভারতের মতো তারকেশ্বরের ঠাঁই করে নিয়েছে ক্ষীরের প্যাঁড়া। আর নতুন হিসেবে চল হয়েছে রঙিন বাতাসার। এখন গোটাদশেক সংস্থা এই বাতাসা তৈরি করে জনা সত্তরের অন্ন সংস্থান করছে।

ওলার মতোই তারকেশ্বরের তাগা তৈরি করেও সংসার চালাতেন বহু মহিলা। কিন্তু সম্প্রতি উত্তর ভারতের প্রভাবে ওই তাগার জায়গা নিয়েছে হলুদ রঙের সুতো। এর ফলেও বৃত্তিচ্যুত হয়েছে বহু জন।

মোটের ওপর শ্রাবণী মেলার কারণে তারকেশ্বরে এখন বহু মানুষ একটু সুখের মুখ দেখছেন। এই মেলার কারণেই এখন বৈদ্যবাটি- শেওড়াফুলিতেও চলছে বাঁক, ঘট, মাটি ও প্লাস্টিকের ঘট, কলসি, বাঁক সাজাবার নানা সামগ্রী ইত্যাদির ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে।

অনেক অসুবিধার মধ্যেই শুরু হয়েছিল তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা। এখন কিন্তু অবস্থার বহু পরিবর্তন হয়েছে। গত পঞ্চাশের দশকেই বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর সড়কটি পাকা হয়। এখন রাস্তার বহু জায়গাতেই আছে আলো। সিঙ্গুরের পর থেকে লোকনাথ পর্যন্ত রয়েছে অনেকগুলি চটি বা বিশ্রামস্থল। যেখানে গরম জল থেকে নানারকম খবারদাবার দেওয়া হয় বিনামূল্যেই। বেড়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে চিকিৎসার ব্যবস্থা। রাজ্যসরকারও শ্রাবণী মেলার জন্য নিচ্ছেন নানা ব্যবস্থা।

একদা যা ছিল মাড়োয়ারি মেলা এখন তা পুরোপুরি শ্রাবণী মেলা। এ মেলায় জলযাত্রীর সংখ্যার সিংহভাগ এখন বাঙ্গালি। এখন ভিড় এত বেশি হয় যে গর্ভগৃহে যাত্রীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না ওই সময়। পরিবর্তে বাইরে রাখা ডোঙায় জল ঢালেন ভক্তরা এবং সে জল গিয়ে পড়ে শিবের মাথায়।

শ্রাবণী মেলার জলযাত্রীদের চরিত্রেও এখন এসেছে বেশ পরিবর্তন। এখন বেশ কিছু উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে তাসা, ডিজে ইত্যাদি বাজনার তালে নাচতে নাচতে জল নিয়ে আসেন। অনেক সময় ট্যাবলোর মতো রথ ইত্যাদি সাজিয়ে প্রতিমা ভাসানের শোভাযাত্রার মতো নানা হুল্লোড় করতে করতে জল নিয়ে আসেন বেশকিছু মানুষ। মনে হয়, এঁদের কাছে বাঁকে জল আনাটা কোনো ধর্মীয় আচার নয়, স্রেফ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের আনন্দের সন্ধানেই এরা জলযাত্রায় শামিল হন।

এসব সত্ত্বেও অধিকাংশ জলযাত্রী শ্রাবণীমেলার সময় তারকেশ্বরে আসেন ভক্তি ও বিশ্বাসের কড়ি কাপড়ে বেঁধে। তারই ফলে বৈদ্যনাথ ধামের মতোই তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা আজ দেশের অন্যতম ভক্ত সমাবেশ। 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধ্বনিতে মুখরিত শ্রাবণীমেলা এখন ভক্তের অন্তরের পরম ধন। □

আমেরিকার জমিদারি মানসিকতাকে বদলে দিয়ে ভারত সহসাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্র-সহ বৈশ্বিক শান্তিস্থাপনে তার অবদান রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠছে। আমেরিকার একচেটিয়া দাদাগিরিতে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ অতিষ্ঠ। বিশ্ব আজ এই দাম্ভিকতার অবসান চায়।

তেল, প্রযুক্তি ও কূটনীতি—বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে ভারতের সাফল্য বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দুয়ার খুলে দেবে

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

গত নির্বাচনে বাইডেন প্রশাসনকে পরাস্ত করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প মিথ্যা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইলন মাস্কের মতো ধনকুবেরকে নিজের ছায়াসঙ্গী করেছিলেন তিনি। ভোটে জেতার পর নিজস্বার্থের কারণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকেও তিনি ছাড় না দিয়ে নিজের মুখ ও মুখোশ দুইটাই উন্মুক্ত করেছেন। তিনি নির্বাচনকে সামনে রেখে যে সব কথা বলেছিলেন ক্ষমতায় এসে সারা পৃথিবীর মানুষকে অবাক করে দিয়ে বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। ভারতীয়দের ভোট কুড়াতে গিয়ে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে একপ্রকার প্রতারণাই করেছেন। বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে তিনি প্রথমেই ভারতীয় নাগরিকদের হাতে কড়া, পায়ে বেড়ি লাগিয়ে দস্তুর মতো অপমান করেছেন। দেখিয়েছেন দম্ভও। ভারতীয়রা নাকি তার বন্ধু এমন কথা বলে শেষে শত্রুর মতো আচরণ করেছেন। তার মনের ভিতরে লুকানো গোপন অভিপ্রায় সেদিন বিশ্বব্যাপী বুঝতে পারেননি। এখন এক এক করে সব কিছুই খোলসা হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ প্রসঙ্গেও যা বলেছেন। এর কারণ আজ আমাদের কাছে অজানা নয়। ট্রাম্পের জানা উচিত ছিল ভারত সারা পৃথিবীকে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও সহিষ্ণুতা শিখিয়েছে। আমরা ভারতীয়রা মৌলিক এই সত্যগুলি মেনেই চলে আসছি। যার কারণে বিশ্বে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের সংস্কৃতি আজ বিশ্বে নন্দিত।

বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে এখন এক সুনামি বয়ে যাচ্ছে। এক সময় যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা, আর হুমকি দিয়ে পৃথিবী শাসন করা আমেরিকার 'নগ্ন দাদাগিরি'র যুগ দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আমেরিকার 'অপরাজেয়তা'র মিথ আজ ভেঙে চুরমার। ওয়াশিংটনের ভেতরের রাজনৈতিক বিভাজন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, আফগানিস্তান থেকে লেজ গুটিয়ে মুখ পুড়িয়ে রাবণের মতো নিজের দেশে ফেরা, ইরাক-লিবিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞ, ইউক্রেন যুদ্ধে সীমিত সাফল্য— সব মিলে মার্কিন আধিপত্যের গায়ে বড়ো ফাটল ধরেছে। ইরানের হাতে হতে হয়েছে করুণভাবে অপদস্থ। তার উপর, চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক উত্থান, রাশিয়ার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন এবং 'গ্লোবাল সাউথ'-এর জাগরণ— সব মিলিয়ে এক বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব দ্রুত গড়ে উঠেছে। এই নতুন মানচিত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন ভারত। এ বিষয়ে দিল্লির বার্তা পরিষ্কার— 'আমরা কারও হাতের পুতুল নই'।

আমেরিকার সঙ্গে বাছাই করা কিছু ক্ষেত্র তথা প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, মহাকাশ ও বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব থাকলেও কোনো সিদ্ধান্তে সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে নারাজ ভারত। রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রশংসনীয় কূটনৈতিক বন্ধন, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিতে গভীর সম্পর্ক; পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ডিসকাউন্টে তেল আমদানি করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতের শক্তি ও সততাকে।

ফঃ ৫

চীনের সঙ্গে কৌশলী ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা, বাজারে সহযোগিতা, আর দেশীয় উৎপাদনে চীনা নির্ভরতা কমানোর অভিযানে ভারত তার নিজস্ব শিল্পনির্মাণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিয়েছে। গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে ভারত। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকার ও ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের দাবি আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরে ভারত এখন বিশ্বগুরুর আসনে আসীন।

সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমি আর্থিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে BRICS (ব্রিকস্) অনেকটাই বিদ্রোহ ঘোষণা করার মতো অবস্থা। ব্রিকস্ এখন কেবল 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা' নয়, এটি একটি 'রাজনৈতিক ঘোষণা'। বিশ্বব্যবস্থা পালটাতে ব্রিকস্ এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার করার মধ্য দিয়ে জাতিসঙ্ঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্বের আসল দাবিদার ও কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। ফলে বিশ্বে আমেরিকার ডলারের নির্ভরতা কমানোর হাতিয়ার এখন ভারতেরই হাতে। সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় মুদ্রায় লেন-দেন করার ফলে মার্কিন ডলারের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙার পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে।

সন্ত্রাসবাদে আমেরিকার দ্বিচারিতার ভূমিকা উন্মোচন করতে সফল হয়েছে ভারত। পাকিস্তানকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে সন্ত্রাসবাদে মার্কিন দ্বিচারিতা প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। চীন-ভারত সংঘাতের মাঝেও বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নিচ্ছে ভারত। লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশে সংঘাত অব্যাহত থাকলেও কূটনৈতিক চ্যানেল খোলা হয়েছে সমস্যা সমাধানের জন্য। ফলে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। চীন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার, বিশেষত ইলেকট্রনিক্স ও টেলিযোগাযোগ খাতে। সেখানেও ভারতের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও পিএলআই স্কিমের মাধ্যমে চীনা আমদানি নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমানোর ফলে স্থানীয় শিল্পের একটা বিশাল উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে স্থানীয় শিল্পের বিকাশ হতে শুরু হয়েছে।

রাশিয়া-ভারত বহুমুখী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রেকর্ড পরিমাণ বাণিজ্যের নজির সৃষ্টি করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত-রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের অঙ্ক ছুঁয়েছে ৬৮.৭ বিলিয়ন ডলার, যা মহামারী-পূর্ব সময়ের ছয় গুণ বেশি। এই রেকর্ড পরিমাণ বাণিজ্যের ফলে ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক এক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাশিয়া থেকে ডিসকাউন্টে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ ভারতের মোট আমদানির প্রায় ৪০ শতাংশ। রুপি-রুবল লেন-দেনের ফলে ডলারের একনায়কত্বে সরাসরি আঘাত করতে সমর্থ হয়েছে ভারত। এছাড়াও প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় যৌথ উৎপাদন, প্রযুক্তি বিনিময়, রক্ষণাবেক্ষণে গভীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুই দেশ এখন পরস্পর পরস্পরের বিশ্বস্ত বন্ধু।

আইএমএফসি বা ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল কমিটির মাধ্যমে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেরেছে ভারত। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর সরাসরি চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রক্ষায় ভারত অত্যন্ত কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করেছে। ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত রেল, বন্দর ও ডিজিটাল করিডোর তৈরির মাধ্যমে উন্নয়নের এক মহাসড়ক তৈরি হওয়ার পথে। ইউরোপে দ্রুত ও সস্তা পণ্য পরিবহনের নতুন রুট, চীনা পথের ওপর নির্ভরতা কমানোর ফলে পণ্য সরবরাহে ব্যয় কমার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এক কথায় বৈশ্বিক সংযোগে ভারতের স্থপতির ভূমিকা এখন নিশ্চিত।

অন্যদিকে আমেরিকার নগ্ন চেহারা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই দু'টি দেশের সঙ্গে আমেরিকার সাম্প্রতিক কূটনৈতিক চালাচাল শিশুসুলভ আচরণের মতো প্রতীয়মান হচ্ছে। পাকিস্তানকে দশকের পর দশক মার্কিন সাহায্য ও সামরিক সহযোগিতার ফলে পাকিস্তান হয়ে উঠেছে সন্ত্রাস রপ্তানিকারী দেশ। আফগান যুদ্ধের সময় মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-প্রশিক্ষিত জঙ্গিরাই পরবর্তীতে ভারত ও আফগানিস্তানে রক্ত ঝরিয়েছে। ওয়াশিংটন জানে, তবু ইসলামাবাদকে রাজনৈতিক ছায়া দিয়ে রেখেছে— শুধু স্বার্থের জন্য।

বাংলাদেশেও নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকায় মার্কিন কূটনৈতিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। ভোটের নামে চাপ, নিষেধাজ্ঞার হুমকি— এই সবকিছুই ভারতের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীকে অস্থিতিশীল করার কৌশল। শ্রমবাজার, গার্মেন্টস রপ্তানি ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের নামে এক নতুন ধরনের 'কূটনৈতিক উপনিবেশ' বানানোর চেষ্টা করছে আমেরিকা। বাস্তবে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে নতুন বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব গড়ে উঠছে, যেখানে ভারতের অবস্থান কেন্দ্রীয়। পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেও ভারত বিকল্প বৈশ্বিক ক্ষমতার জোটে সক্রিয়; ডলারের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে নতুন আর্থিক ব্যবস্থার দিকে এগোনো-সহ আজকের নতুন ভারত 'গ্লোবাল সাউথ'-এর পক্ষে অদম্য কণ্ঠস্বর হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। ভারতের বার্তা ইতিহাসে লিখে রাখার মতো— 'আমরা কারও ছায়ায় দাঁড়াই না; আমরা নিজের পতাকা নিজের হাতে বহন করি।'

বিমস্টেক (BIMSTEC) হলো বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক জোট। এই জোটে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুমাত্রিক। ভারতের 'নেবারহুড ফার্স্ট' ও 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির বাস্তবায়ন আজকে সূর্য উঠার মতো সত্য। ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার ওপর জোর দেয়। বিমস্টেক এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ এর মাধ্যমে ভারত তার বঙ্গোপসাগরীয় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা বাড়িয়ে চলেছে। ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করতে চায়। বিমস্টেক এই নীতি বাস্তবায়নে

একটি সেতু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, কারণ এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে থাইল্যান্ড এবং মায়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশ অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনার কারণে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির দ্বারা গঠিত 'দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা' বা সার্ক (SAARC) প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত বিমস্টেককে একটি শক্তিশালী বিকল্প কার্যকর আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। পাকিস্তান বিমস্টেকের সদস্য নয়। ফলে, পাকিস্তান-ভারত দ্বন্দ্বের ছায়া এই মঞ্চ পড়ে না, যা ভারতকে স্বাচ্ছন্দ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

বিমস্টেকের মাধ্যমে ভারত এই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ভারত 'বিমস্টেক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি' (Free Trade Agreement) বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে, যা এই দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বাড়াতে সাহায্য করবে। এ ছাড়াও পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে সহযোগিতা বাড়ানো ভারতের একটি প্রধান লক্ষ্য। বিমস্টেক মাস্টার প্ল্যানের অধীনে আখাউড়া-আগরতলা আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগের মতো প্রকল্পগুলো এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকার নির্দেশে বাংলাদেশ সরকারের সীমাহীন ভারত বিরোধিতা থাকলেও বাংলাদেশ তার নিজস্ব দরকারে এই রেল সড়ক বাস্তবায়ন করতে স্বাভাবিক কারণেই আগ্রহী হতে বাধ্য হবে। তবে, ইউনুস সরকার যে ভাবে দেশ চালাতে চাইছেন সে ভাবে হয়তো চলবে না। কারণ, বাস্তবতার নিরিখে তাঁর রাজনৈতিক দুর্বলতা ক্রমেই প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি যে আর সামলাতে পারছেন না সেটা এরইমধ্যে অনুমান করা গিয়েছে। তার একগুঁয়ে মনোভাব ইতিমধ্যে দেশটির সর্বনাশ করে ফেলেছে। বর্তমানে ভারত বঙ্গোপাসাগরকে একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল অঞ্চল হিসেবে দেখতে চায়। বিমস্টেক প্ল্যাটফর্মে নিরাপত্তা সহযোগিতা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলোতে ভারত নেতৃত্ব দিচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব বাড়ায় ভারত এই অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়, যা চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হচ্ছে। বিমস্টেকের আওতায় ১৪টি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র রয়েছে। ভারত কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যেমন— পরিবহণ, যোগাযোগ, পর্যটন এবং সন্ত্রাসবাদ দমন। ভারত এই দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ-বাণিজ্য, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের ওপর জোর দিয়ে চলেছে।

সংক্ষেপে, বিমস্টেক ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর মাধ্যমে ভারত কেবল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বাড়াতে চাইছে না, বরং আঞ্চলিক নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেও সচেষ্ট এবং নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এদিকে শুল্কের চাবুক হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে সেটা ট্রাম্পের নিজের বুকেই লেগে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তার শুল্কনীতি ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। ভারতের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ দেখিয়ে শুল্ক বৃদ্ধিকে ভারত এখন আর আমলে নিচ্ছে না। কারণ দেশীয় শিল্পস্থাপন এবং পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারত স্বনির্মাণে এখন সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়েছে। ভারত সরকার পরনির্ভরতা শূন্যের কোঠায় নিয়ে যেতে চাইছে। ভারতের উন্নতি আমেরিকা কোনোদিন ভালো চোখে দেখেনি। আর সেই প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে উঠে ভারতের ওপর অযৌক্তিক শুল্ক চাপিয়ে দিয়ে আমেরিকা নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করছে। অন্যদিকে ভারতকে অস্থিতিশীল করতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে বিশেষ সুবিধা অব্যাহত রেখেছে তারা। ফলে, আমেরিকার বৈরী মনোভাব এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ভারতের অগ্রগতির এই ধারাবাহিকতা বিশেষ লক্ষণীয়। আমেরিকার জমিদারি মানসিকতাকে বদলে দিয়ে ভারত সহসাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্র-সহ বৈশ্বিক শান্তিস্থাপনে তার অবদান রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠছে। আমেরিকার একচেটিয়া দাদাগিরিতে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বিশ্ব আজ এই দাম্ভিকতার অবসান চাইছে। পাশাপাশি ভারতও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে। □

মহিলাদের বিশ্বকাপ দাবায় জয়লাভ দিব্যা দেশমুখের

নিলয় সামন্ত

মহিলাদের বিশ্বকাপ দাবার আগে দিব্যা দেশমুখের নাম খুব বেশি মানুষ জানতেন না। মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার এবং আন্তর্জাতিক মাস্টার দিব্যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আগেও সাফল্য পেয়েছেন। দাবা অলিম্পিয়াডে তিনটি স্বর্ণপদক রয়েছে তাঁর। তবু নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে তাঁর তেমন পরিচিতি ছিল না এত দিন। গত ২৩ জুলাই মেয়েদের ফিডে বিশ্বকাপ দাবার সেমিফাইনালে জয় তাঁকে তারকার মর্যাদা দিয়েছে। একাধিক আন্তর্জাতিক সাফল্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দাবার নতুন চমক হিসেবে

বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে মুখোমুখি কোনেরু হাম্পি ও দিব্যা দেশমুখ।

অভিহিত হচ্ছেন দিব্যা। আরও আগেই হয়তো তাঁর স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল। ১৫ বছর বয়সে মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার পর ১৭ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক মাস্টার হন দিব্যা। তবু ভারতের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে সুপরিচিত হওয়ার জন্য ১৯ বছরের দাবাড়ুকে অবেক্ষা করতে হলো বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা পর্যন্ত! ভারতে মহিলা দাবার মুখ দীর্ঘদিন ধরে কোনেরু হাম্পি। তিনিই দেশের এক নম্বর। ঘটনাচক্রে তাঁর বিরুদ্ধেই বিশ্বকাপ ফাইনাল দিব্যার।

নাগপুরে জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। বাবা জিতেন্দ্র দেশমুখ এবং মা নম্রতা দেশমুখ দু'জনেই চিকিৎসক। দিদিকে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। পাঁচ বছর বয়সেই দাবাকে আপন করে নেন। সেই ছোট্ট বয়সেই সাদা-কালো ৬৪ খোপের খেলাকে নিজের স্বপ্নপূরণের মাধ্যম করে নিয়েছিলেন। পাঁচ বছরে দাবা খেলতে শুরু করে সাত বছর বয়সেই জাতীয় স্তরে সাফল্য। ছ'বছর পূর্ণ হওয়ার কিছু দিন পর নাম দেন অনূর্ধ্ব-৭ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে। 'দাবাড়ু দিব্যা'র বয়স তখন বছর খানেক। ২০১২ সালের সেই প্রতিযোগিতাতেই পদক জয়। এরপর ২০১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনূর্ধ্ব-১০ বিশ্বখেতাব। ২০১৭ সালে ব্রাজিলে অনূর্ধ্ব-১২ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন। এগের পর এক সাফল্যে ভর করে এগিয়েছেন দাবাড়ু দিব্যা। দেখতে দেখতে মহিলাদের ফিডে মাস্টার এবং ২০২১ সালে মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার। ঠিক দু'বছর পর ২০২৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হয়েছেন। গত বছর জিতেছেন অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ। একের পর এক সাফল্য ধরা দিয়েছে দিব্যার দাবার বোর্ডে। দাবায় এমন ধারাবাহিকতা সহজ নয়। অথচ এই কঠিন কাজটাই করে দেখাচ্ছেন ভারতীয় দাবার বিস্ময় বালিকা। চেন্নাইয়ের 'চেস গুরুকুল'-এর আর.বি. রমেশ দিব্যার কোচ। রমেশের তত্ত্বাবধানেই দিব্যার উত্থান। আগ্রাসী খেলা পছন্দ হলেও ঝুঁকি নেন হিসেব কষে। নিখুঁত কৌশল এবং ঠাণ্ডা মাথা দিব্যার অন্যতম শক্তি।

গত বছর দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতের সোনাজয়ী মহিলা দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। দেশের সোনা জয়ের সাফল্যে দিব্যার পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। গত বছরই ওয়ার্ল্ড টিম র‍্যাপিড এবং ব্লিৎজ চ্যাম্পিয়নশিপেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে এশিয়া এবং বিশ্ব পর্যায়ের একাধিক খেতাব। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারানোর অভিজ্ঞতা।

দেশ-বিদেশে বহু লড়াই জয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে দিব্যা গিয়েছিলেন ফিডে বিশ্বকাপে। ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতায় একের পর এক প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছেন। প্রথম দশে থাকা তিন জনকে হারতে হয়েছে দিব্যার কাছে। না, তাঁকে ঘিরে এতটা প্রত্যাশা ছিল না ভারতীয় দাবা মহলের। দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের তো নয়ই। প্রত্যাশার চাপ না থাকাটাও হয়তো সাহায্য করেছে প্রতিযোগিতার ১৫তম বাছাইকে। ভারত থেকে যে প্রথম বার মহিলাদের দাবা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবে তা আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন ছিল কে জিতবেন? ৩৮ বছরের কোনেরু হাম্পি, না ১৯ বছরের দিব্যা দেশমুখ? শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করলেন দিব্যা। গত ২৮ জুলাই টাইব্রেকারে তিনি হারালেন হাম্পিকে। দ্বিতীয় র‍্যাপিড গেম জিতে চ্যাম্পিয়ন হলেন দিব্যা। দুটো ক্লাসিক্যাল গেম ড্র হওয়ায় খেলা গড়িয়েছিল টাইব্রেকারে। সেখানে প্রথম র‍্যাপিড গেমে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেন দিব্যা। তিনি শুরু করেন 'পেট্রভস ডিফেন্স' দিয়ে। দুই প্রতিযোগীই আক্রমণাত্মক খেলছিলেন। দ্রুত চাল বিনিময় হচ্ছিল। সময় কমছিল। কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কেউ জেতার মতো জায়গায় নেই। ফলে বাধ্য হয়ে ড্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন দিব্যা ও হাম্পি।

দ্বিতীয় র‍্যাপিড গেমে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেন হাম্পি। তিনি শুরু করেন 'কুইন্স গ্যাম্বিট' দিয়ে। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেললেও দিব্যা জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সময় কম নিচ্ছিলেন। অন্য দিকে হাম্পি চাল দিতে সময় নিচ্ছিলেন বেশি। ফলে তাঁর ঘড়িতে সময় কমছিল। একটা সময় ৮ মিনিট এগিয়ে ছিলেন দিব্যা। বাধ্য হয়ে ড্র করার চেষ্টা করেন হাম্পি। কিন্তু পারেননি তিনি। চাপের মুখে একটা ভুল চাল দিয়ে ফেলেন হাম্পি। সেইটাই কাজে লাগান দিব্যা। ৩৪ চালের পর হার মেনে নিতে বাধ্য হন হাম্পি। অভিজ্ঞতায় হাম্পির থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলেন দিব্যা। কিন্তু তিনি বাজিমাত করলেন আগ্রাসন কাজে লাগিয়ে। গোটা প্রতিযোগিতায় আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলেছেন তিনি। তুলনায় হাম্পিকে অনেক বেশি রক্ষণাত্মক দেখিয়েছে। নিজের দ্বিগুণ বয়সি হাম্পিকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেন দিব্যা। □

মণিপুরি নৃত্য কর্মশালা তুলে ধরল ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

সংস্কার ভারতীর অসম ও ত্রিপুরা প্রান্তে সম্প্রতি মণিপুরি নৃত্যের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দুটি রাজ্যের সংস্কৃতি সচেতন অসংখ্য মানুষ এবং নৃত্য শিল্পীরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মণিপুরি ধারার বিশিষ্ট শিল্পী ড. সুমিত বসু। দূরদর্শন-সহ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে এই কর্মশালার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি এই কর্মশালার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে।

নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত চার প্রকার নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে। যেমন— আবন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী এবং ঔড্রমাগধী। মহর্ষি ভরত লিখেছেন— 'অঙ্গা বঙ্গা উৎকলিঙ্গা/ বৎসাশ্চৈবৌড্রমাগধা'। অবন্তী অর্থাৎ মধ্যভারত ছাড়া বাকি সব অঞ্চলের নৃত্যধারার পুনর্জাগরণ ঘটেছে। নাট্যশাস্ত্রের যুগ শেষ হয়ে গেলে নাট্যশাস্ত্রের নির্যাসের ভিত্তিতে আঞ্চলিক অভিজাত নৃত্য গীতের ধারা গড়ে ওঠে। এখানে ঔড্রমাগধী বলতে মগধের পূর্ব দিক অর্থাৎ পূর্ব ভারতের কথাই বলা হয়েছে। ওড়িশি, মণিপুরী, গৌড়ীয় এবং সত্রীয় নৃত্যধারা এই অঞ্চলের প্রাচীন শাস্ত্রকে অনুসরণ গকরে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। পুরাণ, কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, পটচিত্র, মন্দির ভাস্কর্য বা দেবদাসী সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই এই অনুপম শিল্প যুগ যুগ ধরে টিকে রয়েছে।

উনিশ শতকের গোড়ায় কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর চৌধুরী পাশ্চাত্য কৌশল ও ভারতীয় ভাবনায় এক অপূর্ব নৃত্যশৈলী উপস্থাপন করেছিলেন। তখনও আজকের ধ্রুপদী নৃত্যধারার চর্চা উদ্‌ঘাটন হয়নি। ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার অনুসন্ধানের অন্যতম ব্যক্তিত্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি শান্তিনিকেতনে সংগীত নৃত্যের চর্চায় যুক্ত করেছিলেন মণিপুরি নৃত্যকে। তিনি নিজে কখনো মণিপুর যাননি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজসভায় মণিপুরি রাস নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান এবং মণিপুরি নৃত্য শিক্ষকদের শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন।

ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর বাড়ির সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যর সঙ্গে বিশেষ সখ্যতা ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের। ১৮৮৬ সালে রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ করেন। ১৯২০ সালের মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজাকে লিখেছেন কয়েকমাস হলো বুদ্ধিমন্ত সিংহ শান্তিনিকেতনে এসেছেন এবং নাচ শেখাচ্ছেন।

মণিপুরি নৃত্য মহর্ষি বর্ণিত এই প্রাচীন ধারার অন্যতম। স্থানীয় এলাকায় এই নৃত্য 'জাগই' নামে পরিচিত। মণিপুর ভাষায় লাই শব্দের অর্থ হলো দেবতা, হারাউবা মানে আনন্দ। মণিপুরি নৃত্যকে এককথায় বলে 'লাইহারাউবা'। মণিপুরের প্রাচীন লোক পুরাণ মতে নয়জন লাইবুঙথ (দেবতা) ও সাতজন লাইনুরা (দেবী) পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল এবং তাতেই সাতজন লাইনুরা নৃত্য করেছিলেন। এই দৃশ্য নয়জন লাইবুঙথ দেখে স্বর্গ থেকে মাটি নিক্ষেপ করতে থাকেন। নৃত্যরতা সেই সাতজন লাইনুরা যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে নৃত্য পরিবেশন করতে থাকেন সেই অংশটাই পৃথিবীর স্থলভাগ। এই ভাবনা থেকেই লাইহারাউবা নৃত্যের সূচনা। এই নৃত্যধারায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের বলে মৈবা (দেবদাস) ও মৈবী (দেবদাসী)। সতেরশো শতকে পামহৈবা নামে এক পরাক্রান্ত রাজা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভাবাশ্রিত বৈষ্ণব মত ও পরম্পরায় অনুপ্রাণিত হওয়ায় শৈব সম্প্রদায়ের মণিপুরবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন আসে। বৈষ্ণব আধিপত্যের ফলে লাইহারাউবা প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যায়।

১৮৪৪ সালে রাজা চন্দ্রকীর্তি মণিপুরের সিংহাসনে বসার পর তিনি লাইহারাউবা নৃত্যের পুনরায় প্রচলন করেন। বর্তমানে লাইহারাউবা বৈষ্ণব ও শৈব দুটি ধারাতেই পরিবেশিত হয়।

অধ্যাপক সুমিত বসু তাঁর কর্মশালায় মণিপুরি নৃত্যের সেকাল ও একালকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। রাজকুমার সিংহজিৎ সিংহ, সিনাম বসু সিংহ, কনসাম ইবোমচা সিংহ, আমুরি সিংহ, বিপিন সিংহদের হাত ধরে এই নৃত্য মাধুর্য গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করেছে এবং সমাদৃত হয়েছে। সংস্কার ভারতীর কাজের মূল উদ্দেশ্যই বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। অধ্যাপক বসু এই কাজটাই করে দেখিয়েছেন। □

নবাঙ্কুর

স্বর্গ লাভের উপায়

দেবরাজ ইন্দ্র বহুদিন ধরে খুব চিন্তায় ছিলেন। স্বর্গে বেশ কিছুকাল ধরে আবির্ভাব ঘটছে না কোনো দেবপুত্রের। দেবরাজ ভাবতে লাগলেন। মর্ত্যের মানুষদের মধ্যে অধর্ম খুব বেড়ে গেছে, তাই এই অবস্থা। মর্ত্যলোকের দিকে তাকিয়ে দেবরাজ লক্ষ্য করলেন সত্যিই সাধু সন্ন্যাসীরা ধর্ম-কর্ম ছেড়ে মেতে রয়েছেন অন্য সব কাজে। সাধু সন্ন্যাসী যারা মানুষকে সৎপথে চালিত করবেন তাঁরাই বিষয় সম্পত্তি ভোগে মত্ত। তাহলে মর্ত্যবাসীর কী হবে? দেবরাজ ঠিক করলেন, মর্ত্যবাসীদের এই পাপ কাজ থেকে বিরত করবেন। তা না হলে মর্ত্যের মানুষ যাবে রসাতলে।

দেবরাজ ইন্দ্র নিজে এক ভয়ংকর ব্যাধের বেশ ধরলেন আর তাঁর সারথি মাতলি ধরলেন এক ভয়ংকর কুকুরের বেশ। তাঁরা উপস্থিত হলেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে। মর্ত্যের লোকেরা ভয়ংকর কুকুরকে দেখে ভয়ে অস্থির। কুকুরের বিকট চিৎকারে মর্ত্য কাঁপতে লাগল থরথর করে।

এদিকে মর্ত্যলোকের মহারাজের কাছে খবর গেল, মর্ত্যে হাজির হয়েছে এক ব্যাধ তার ভয়ংকর কুকুরকে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আদেশ দিলে তাকে রাজ দরবারে উপস্থিত করতে।

রাজার লোকেরা তার কাছে পৌঁছাবার আগেই দেবরাজ ইন্দ্র কুকুররূপী তাঁর সারথি মাতলিকে নিয়ে হাজির হলেন রাজদরবারে। মহারাজ এই দেখে রাগে ফেটে পড়লেন। কোনোমতে নিজেকে সংবরণ করে বললেন, কেন এই কুকুরটাকে নিয়ে এসেছে রাজদরবারে?

ব্যাধরূপী দেবরাজ বললেন, আমার এই কুকুরটার খুব খিদে পেয়েছে। এই কথা শুনে মহারাজা একজন ভৃত্যকে বললেন যাও, কুকুরটার জন্য খাবার নিয়ে এস।

ভৃত্য কুকুরটার জন্য খাবার নিয়ে এল। কিন্তু কুকুরটার খিদে মিটছিল না কিছুতেই। একসময় রাজবাড়ির সব খাবার শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কুকুরের পেট ভরল না।

মহারাজ বুঝতে পারলেন, এই কুকুরটা কোনো সাধারণ কুকুর নয়। ব্যাধরূপী দেবরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, কুকুরটার আসল পরিচয় কী? ব্যাধ বললেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র আর কুকুরটি হলো আমার সারথি মাতলি। মর্ত্যলোকে যে পাপ কার্য চলছে তা দেখবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। মর্ত্যলোকে সবাই অসাধু কাজকর্মে লিপ্ত, এমনকী সাধু সন্ন্যাসীরাও। এসব বন্ধ হওয়া উচিত।

এই কথা শুনে মহারাজ ও মর্ত্যবাসী লোকজন বলল, ক্ষমা করুন দেবরাজ. আমরা এবার থেকে সৎপথে চলব। কোনোরকম পাপকাজে লিপ্ত হবে না।

দেবরাজ ও মাতলি খুব খুশি হয়ে সকলেকে আশীর্বাদ করে স্বর্গে ফিরে গেলেনে।

(সংগৃহীত)

জাতীয় উদ্যান

কাঙ্গের ভ্যালি

কাঙ্গের ভ্যালি জাতীয় উদ্যান ছত্তিশগড় রাজ্যের বস্তার অঞ্চলের একটি জাতীয় উদ্যান। এটি ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যান পশ্চিমে তীর্থগড় জলপ্রপাত থেকে পূর্বে কোলাব নদী (ওড়িশা রাজ্য সীমানা) বিস্তৃত। কাঙ্গের নদীর নামানুসারে এই উদ্যানের নামকরণ হয়েছে। এই উদ্যানে শাল, সেগুন ও বাঁশের প্রধান্য রয়েছে। গবেষণা সংস্থার গণনা অনুযায়ী এই উদ্যানে ৫৫৩ রকমের ফুল, ৪৯ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১৬ প্রজাতির উভচর, ৩৭ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৬ প্রজাতির মাছ, ৯১ প্রজাতির প্রজাপতি, ২৬ প্রজাতির পতঙ্গ এবং ১১৩ প্রজাতির মাকড়সা রয়েছে। দর্শনীয় হলো তীর্থগড় জলপ্রপাত, কোটুমসার গুহা, কৈলাস গুহা, ভৈনসা গুহা, কাঙ্গের ধারা ও দণ্ডক গুহা। এই উদ্যান দর্শনের সেরা সময় হলো নভেম্বর থেকে জুন মাস।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮০

অভ্যাসং কুর্ম: –

बालिका हसति। बालिका: हसन्ति।

বালিকা হাসে। বালিকারা হাসে।

सेविका खादति। सेविका: खादन्ति।

पाचिका पचति। पाचिका: पचन्ति:।

महिला ....। ....।

.... अभिनयति। नायिका: ....।

कन्या क्रीडति। कन्या: ....।

लेखिका लिखति। ....।

अम्बा हसच्ति। अम्बा: हसन्ति।

प्रयोगं कुर्म: –

गच्छति, आागच्छति, पठति, लिखति, पिबति, वदति, पश्यति।

ভালো কথা

ড্রেনে কুকুরছানা

সেদিন স্কুল থেকে আমরা ফিরছিলাম। বাজারের মধ্যে একটি কালো কুকুরি আমাদের দেখে কাছে এসে কুঁই কুঁই করছিল। আমরা বুঝতে পারছিলাম না। এক সময় কুকুরিটা আমাদের পায়ের কাছে লুটোপুটি করে ড্রেনের দিকে দৌড়ে গিয়ে আবার আমাদের কাছে এসে কুঁইকুঁই করতে শুরু করে। আমরা ড্রেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি চারটে কুকুরের ছানা ড্রেনের মধ্যে কাদায় পড়ে আছে। আমরা কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তখনই প্রিয়াঙ্কা ওর স্কুলব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে লাফিয়ে ড্রেনের মধ্যে নেমে এক-এক করে চারটে ছানাই তুলে দিল। তারপর উপরে উঠে পাশেই কলের জলে সবকটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করল। ওর স্কুল ড্রেসে কাদা লেগে একাকার । ওর মুখটা তখন আনন্দে উজ্জ্বল। আর আমাদের খুব ছোটো মনে হচ্ছিল।

তনুশ্রী বিশ্বাস, সপ্তমশ্রেণী, স্টেশন রোড, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

কুম্ভকর্ণ

সৃজা দাঁ, একাদশশ্রেণী, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর।

পর্বতকায় শরীরটা তার
রাবণরাজার ভ্রাতা,
পা ফেললেই ভূমিকম্প
রিখটার স্কেল ফাটা।
নিঃশ্বাসে তার টর্নেডো বয়
চিৎকারে হৃদ্‌কম্প,
জন্তু মানুষ গপ্‌সে গিলে
আনন্দে দেয় লম্ফ।

মুনি ঋষিরাও বাদ পড়ে না
দেবতারাও কাত
এসব দেখে ব্রহ্মাদেব
করেন অভিসম্পাত—
এত পাপ করিস তুই
তাও মেটে না আশ,
একদিন তুই জাগবি মোটে
ঘুমুবি ছয়মাস।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কারও বিরোধী নয়, দেশ সেবাই তাদের মূলমন্ত্র

অমিত কুমার চৌধুরী

'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কি মুসলমান বিরোধী সংগঠন? এমন প্রশ্ন করেন ক্যান? শুনলে তো ঘোড়াতেও হাসব। এমন বোকা বোকা প্রশ্ন কেউ করে? এক দুগ্ধপোষ্য শিশুও জানে আরএসএস মুসলমান বিরোধী। দেশের অতি নগণ্য এক সাধারণ মানুষ থেকে বুদ্ধিজীবী সকলের কাছেই আরএসএস মুসলমান বিরোধী বলে পরিচিত একটি সংগঠন।' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তিতে এই সংগঠনটিকে নিয়ে এরকম বিভিন্ন আলোচনা দেশব্যাপী চলছে। এই সংগঠনটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ এটি মুসলমান বিরোধী সংগঠন। একটু দেখা যাক, সত্যিই কি তাই?

যে কোনো সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে তার আদর্শগত ভিত্তি ও কার্যকলাপ, তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক কেমন, তার উপর। সঙ্ঘের তাত্ত্বিক বা আদর্শগত দিক হলো, এই সংগঠনটি বিশ্বাস করে— ১. ভারতবর্ষ হিন্দুরাষ্ট্র, ২. হিন্দুত্বই এদেশের রাষ্ট্রীয়ত্ব, ৩. এদেশের মূল সমাজ হিন্দু সমাজ, ৪. হিন্দু অনৈক্যের জন্য দেশ দুর্বল ও খণ্ডিত হয়েছে। ৫. দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করতে হলে হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও স্বাভিমানবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার এও বিশ্বাস করতেন যে এই সুপ্রাচীন দেশ এক সময় বিশ্বে শ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। সেই দেশ ও সমাজের পতনের মূল কারণ হিন্দুরা, কোনো বিদেশি বা বিধর্মীরা দায়ী নয়। সুতরাং হিন্দুদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে এদেশের উত্থানের জন্য। কারণ হিন্দুরাই এদেশকে পুণ্যভূমি বলে মনে করে।

এখন দেখা যাক উপরিউক্ত আদর্শগুলি কারও বিরোধী কি না। ১. আধুনিক গবেষণা অনুসারে প্রায় দশ হাজার বছরের এক প্রাচীন রাষ্ট্র, যা সুদূর অতীতকাল থেকে এক ঐতিহ্য পরম্পরা বয়ে নিয়ে চলেছে আজ পর্যন্ত। কোনো বিদেশি গবেষক যদি রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করতে চায় তবে নিশ্চয় তিনি আমেরিকা, আফ্রিকা বা আরব দেশে যাবে না, নিশ্চিত রূপে ভারতেই আসবে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি ছাড়াও অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের বাস থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গকে বাঙ্গালিস্থান, বঙ্গভূমি বলাটা যেমন অযৌক্তিক নয় ঠিক তেমনি ভারতের অধিকাংশ মানুষ হিন্দু সংস্কৃতি, ধর্ম মেনে চলায় ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলা কোনো অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়। তাছাড়া ভারতে বসবাসকারী অহিন্দুরা যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল, যারা ধর্মান্তরিত হিন্দু, জাতিগতভাবে তারাও হিন্দু। ভারতের আর এক নাম হিন্দুস্থান।

২. কংগ্রেস সভানেত্রী, আইরিশ মহিলা, অ্যানি বেসান্তের মতে ভারতের মূল প্রোথিত রয়েছে হিন্দুত্বে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ভারতের আত্মা হচ্ছে ধর্ম (হিন্দুধর্ম) ঋষি অরবিন্দ ভারতের জাতীয়তাকে হিন্দু জাতীয়তা বলেছেন। দেশের সুপ্রিম কোর্ট হিন্দুত্বকে ভারতের হিন্দু জীবনধারা, জীবনদর্শন বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় সভ্যতার মূল আশ্রয়টি হলো সমাজ (হিন্দু) আর সেই সমাজ একান্তভাবে ধর্মের (হিন্দু) উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি হলো দেবাশ্রয়ী ধর্ম যাকে ধারণ করে গড়ে উঠা জীবনচর্যাই হলো হিন্দুত্ব। ইংল্যান্ডের ইংরেজত্ব, জার্মানির জার্মানিত্ব, ফ্রান্সের ফরাসিত্ব ঠিক তেমন ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব।

৩. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন ভারতের মূল সমাজ হলো হিন্দু সমাজ। বর্তমানে ভারতে হিন্দুর পাশাপাশি অহিন্দুরা বাস করা সত্ত্বেও আমাদের সকলের পরিচয় বৃহত্তর অর্থে হিন্দু, কারণ বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলো হিন্দু ধর্মেরই শাখা। বৃহত্তর অর্থে এরা সকলেই হিন্দু। মুসলমান ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর মতবাদ ভারতে উদ্ভূত নয়, বিদেশে। কিন্তু ওঁরা বিদেশ থেকে আসা জনগোষ্ঠী নয়। ভারতের মুসলমান ও খ্রিস্টানদের পূর্বপুরুষ সবাই হিন্দু। তাই জাতিগত ভাবে সকলেই হিন্দু। বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি, ভারতের শিক্ষামন্ত্রী করিমভাই চাগলা বলেছেন, ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা জাতিগতভাবে হিন্দু।

ফ ঃ ৬

দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম আবদুল্লা বুখারি মক্কায় হজ করতে গেলে তাকে আরবের মুসলমানেরা হিন্দু বলে ডাকে। রবীন্দ্রনাথ তাই হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-খ্রিস্টান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৪. ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে হিন্দুরা যেখানে দুর্বল হয়েছে সেখানে তারা পরাজিত হয়েছে এবং সেই অঞ্চলগুলি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে, হিন্দু অনৈক্যের জন্যই ভারত দুর্বল ও টুকরো হয়েছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ তার উদাহরণ। বর্তমান ভারতেও যেসব অঞ্চলে হিন্দুরা দুর্বল ও অসংগঠিত, সেখানে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয়। আর সেই সব অঞ্চলেই বিচ্ছিন্নতার আওয়াজ শোনা যায়।

৫. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে। আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এই নয় মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই। তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। স্বামীজী বলেছেন, হিন্দু পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন, যে ভাষাভাষীই হোক না কেন, যে নামধারীই হউক না কেন, নিজ সন্তান বিপদে পড়লে যেমন তুমি উদ্বিগ্ন হও তেমন যে কোনো হিন্দুর বিপদে তুমিও উদ্বিগ্ন হবে। হিন্দুদের মধ্যে এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন যা হিন্দুদের পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখাবে ঐক্যবদ্ধ করতে শেখাবে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে কোনো ব্যক্তিকেই ছোটো জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে।' চিকাগো বিশ্বধর্মসভায় স্বামীজী নিজেকে হিন্দু সন্ন্যাসী হিসেবে পরিচয় দিয়ে হিন্দু স্বাভিমানবোধ জাগ্রত করেছিলেন যা সকল হিন্দুর মধ্যে জাগ্রত করা প্রয়োজন বলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশ্বাস। সঙ্ঘের আদর্শগুলো কি মুসলমান বিরোধী? আর হলে, রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজী, শরৎচন্দ্রের কথাগুলো কি মুসলমান বিরোধী হবে? না, তা কখনোই নয়।

এবার সঙ্ঘের কার্যকলাপ বা ব্যবহারিক দিক দেখা যাক। সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা দাঙ্গাবাজ। বাজপেয়ীজীর ছয় বছর, নরেন্দ্র মোদীর এগারো বছর কেন্দ্রে সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত লোকেরাই দেশ শাসন করছে অথচ দেশে কোনো দাঙ্গা হয় না। ব্যতিক্রম শুধু গুজরাট, তবুও তার জন্য জেহাদি মুসলমানরাই দায়ী, কারণ নিরীহ, নিরস্ত্র হিন্দুদের মুসলমানরাই পুড়িয়ে মেরেছিল। এছাড়া কোনো রাজ্যে বিজেপির শাসনে কোনো দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। আজ পর্যন্ত কোনো দাঙ্গায় সঙ্ঘের নাম জড়ায়নি বা দেশের কোনো আদালত দাঙ্গার জন্য সঙ্ঘকে দোষী সাব্যস্ত করেনি। যদি সঙ্ঘ দাঙ্গা করতো তাহলে কেন সঙ্ঘ বিরোধী দলগুলো যারা দেশে বেশিরভাগ সময় শাসন করেছে, দাঙ্গা করার জন্য সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করেনি বা তাদের কার্যকর্তাদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি দেয়নি? কারও কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে সঙ্ঘ বাধা সৃষ্টি করেনি বা তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেনি। দেশের যখন যখন বিপদ এসেছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে স্বয়ংসেবকরা সব সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। গুজরাটের মোর্ভিতে একবার বন্যায় মুসলমান ভাইদেরও স্বয়ংসেবকরা সাহায্যই শুধু করেনি তাদের নমাজ পড়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিল। শাহবানু মামলায় সঙ্ঘ ওই অসহায় মুসলমান নারীর আত্মমর্যাদাকে সম্মান জানিয়েছে। এপিজে আবদুল কালাম দেশের রাষ্ট্রপতি হলে তৎকালীন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক কেএস সুদর্শন তাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ নীতিতে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানেরাও সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে, কোনো বৈষম্য করা হয়নি মুলমানদের প্রতি। জন ধন যোজনা, আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সব সুযোগ মুসলমানেরাও পাচ্ছে। সিকান্দার বখ্ত, আরিফ বেগ, শাহ নওয়াজ হোসেন, মাফুজা খাতুন প্রমুখ নেতা-নেত্রীরা বিজেপি দলে সম্মানের সঙ্গে ছিলেন ও আছেন। রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ বলে সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত একটি সংগঠন আছে যার উদ্দেশ্য যত রাষ্ট্রভক্ত মুসলমান আছেন তাদেরকে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে নিয়ে আসা। কেউ বলতে পারেন সঙ্ঘে মুসলমান নেই কেন? সঙ্ঘে বহু রাষ্ট্রভক্ত মুসলমান আছেন। তাছাড়া হিন্দু সংগঠনে হিন্দুরাই থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এটা মুসলমান বিরোধিতা নয়। কেউ বাণিজ্য বিভাগে পড়াশোনা করলে বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। ব্যক্তির রুচি, প্রয়োজন অনুসারে তার পথ সে বেছে নেয়। কোনো ব্যক্তি ব্যায়াম করে তার শরীর সুগঠিত করলে অন্যের আশঙ্কার কারণ হতে পারে না। হিন্দু সমাজ দুর্বল অসংগঠিত, তাই হিন্দু সমাজের স্বার্থে হিন্দুদের সংগঠিত করা মুসলমান বিরোধিতা নয়।

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোভাবেই সঙ্ঘকে মুসলমান বিরোধী বলা যায় না। যারা দেশ বিরোধী, তারা হিন্দু বা মুসলমান হোক, কেবলমাত্র তাদের বিরোধী। □

শোক সংবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্বয়ংসেবক ডায়মন্ড হারবার কোর্টের আইনজীবী তথা অধিবক্তা পরিষদের পূর্বতন সদস্য প্রবীর কুমার পুরকাইতের পিতৃদেব অহিভূষণ পুরকাইত গত ৩০ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী,২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, সঙ্ঘের গঙ্গাসাগর জেলার প্রথম কার্যালয় তাঁর বাড়িতেই ছিল।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের কসবা ভাগের ৪ নগর প্রচারক আশিস কুমার মণ্ডলের বাবা সুনীল কুমার মণ্ডল গত ১৭ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্য ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

সঙ্ঘের দক্ষিণ বীরভূম জেলার সিউড়ী নগরের উপকণ্ঠে লম্বোদরপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক দুঃখহরণ দাস গত ৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

জলপাইগুড়ি নগরের স্বয়ংসেবক, পূর্বতন জেলা কার্যবাহ, পূর্ব প্রচারক সুকুমার দে'র মাতৃদেবী পুষ্পলতা দে গত ১১ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

* * *

গত ১৩ আগস্ট লোকান্তরিত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব প্রচারক শঙ্কর বাগ। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ কন্যা-জামাতা ও ১ নাতিকে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর মূল বাড়ি মেদিনীপুর জেলার সবং থানায়। ১৯৭০ সালে মেদিনীপুর কলেজে পড়া এবং মেসে থাকার সুবাদে স্বয়ংসেবক হন। ১৯৭৩ সালে স্নাতক হওয়ার পর সঙ্ঘের প্রচারক জীবন গ্রহণ করেন। প্রথম প্রচারক কামারপুকুরে। পরে বারাসাত জেলা এবং উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রচারক জীবন থেকে অবসর নিয়ে হোমিওপ্যাথিতে ডিএমএস পাশ করে হালিসহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

ব্যাক বেঞ্চারস্ সেলুলয়েডীয় আলোড়ন!

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কেরালার একটা মুভি 'স্থানার্থী শ্রীকুট্টন' বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের বসানো নিয়ে আলোড়ন তুলেছে। তার থেকে অনুপ্রাণিত হয় কেরালা-সহ সারাদেশের অনেক বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের পেছনে বসা ছাত্র-ছাত্রীদের (back benchers) কথা ভেবে অভিনব এক প্যাটার্নে শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চগুলো সাজানো শুরু হয়েছে। কোনো ছাত্রকেই যাতে পেছনের সারিতে বসতে না হয় তার জন্য শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদেরকে বসানো হচ্ছে ইউ আকারে। মাস্টারমশাই, দিদিমণিরা বসছেন অর্ধচন্দ্রের জ্যা-র বিপরীতে ব্যাসের কেন্দ্রে। এতে লাভটা হচ্ছে কী---শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে সমানভাবে নজরে রাখতে পারছেন, আর অন্যদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দৃষ্টি অবরোধ করার কেউ থাকছে না।

অনেকে বলেন, পেছনের সারিতে বসা ছাত্রদের উপর শিক্ষক- শিক্ষিকাদের চিরাচরিত একটা অবজ্ঞা, অবহেলা থাকে। তাদের ওপর সমান দৃষ্টি না দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষকদের পালটানো উচিত। কারণ, একটি শ্রেণীর মেধাবী, মধ্য ও স্বল্প মেধাসম্পন্ন সকল ছাত্রের ওপরে সমান গুরুত্ব দেওয়া তাঁদের কর্তব্য। একেবারে সঠিক কথা। একজন শিক্ষক হিসেবে আমি তো মনে করি— শ্রেণীতে পাঠদানের সময় স্বল্প মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষের ব্যাকবেঞ্চারদের নিয়ে অনেক কথা হয়— বিদ্যালয়ের স্টাফ কমন রুমের সরস আলোচনায়, অভিযোগের বারোমাস্যায় মেধাবীদের তুলনায় সংখ্যালঘু ওই ছাত্রদের স্থান সর্বাধিক। তাদের সম্পর্কে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের একটা অবজ্ঞা, অপছন্দ থাকে এটা অনস্বীকার্য।

শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা মূলত প্রতিক্রিয়াশীলতায় বিশ্বাসী তাঁরা এটা করেন। পেছনের সারিতে যারা বসে তারা স্বেচ্ছায় বসে। কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা অবজ্ঞাভরে তাদের জোর করে পেছনের বেঞ্চে বসান না। এমনও দেখা যায় সামনের বেঞ্চ ফাঁকা থাকলেও তারা সেই নিজেদের জায়গাতেই বসে। কোনো শিক্ষক তাদের সামনে নিয়ে এলেও, দেখা যায় পরের পিরিয়ডে আবার পেছনের বেঞ্চে চলে গেছে। সাধারণত দেখা যায় কোনো শ্রেণীর যে সমস্ত ছাত্র পেছনের বেঞ্চে বসে তারা নিয়মিত বসে, সামনের বেঞ্চ ফাঁকা থাকলেও পেছনেই বসে। এর পেছনে তাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। তারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী, পাঠ বোঝার চেষ্টা না করে বিশৃঙ্খল আচরণে লিপ্ত থাকে, নিজেদের মধ্যে খুনসুটি চালিয়ে যায়। ইতিহাসের ক্লাসে অঙ্ক বই খুলে বসে থাকা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্দেশ মতো শ্রেণীকক্ষের কাজ না করা এদের বিশেষ চরিত্র।

অবশ্য এটাও ঠিক যে, আক্ষরিক অর্থে পেছনে থাকার অন্যতম কারণ শিখন সামর্থ্যে পিছিয়ে থাকা। পেছনের সারিতে বসা ছাত্রদের সাধারণত সবাই বিচ্ছু হয় না। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হলেও কয়েকজন থাকে ভীষণ ডেলিংকোয়েন্ট। তাদেরকে নিয়ে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূরিভূরি অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা হয়। পেছনের সারিতে বসার পেছনে তাদের একান্ত ইচ্ছা কাজ করে এবং শ্রেণীকক্ষের মধ্যে শিক্ষকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে একটা পঠনপাঠন দিবসে তারা যা যা করে সবই পেছনে বসার

সুযোগহেতু। নানান অনাসৃষ্টি আচরণ যেমন— সামনে বসা ছাত্রদের ডিস্টার্ব করা, খামচা খামচি করা, অন্যের ব্যাগ থেকে কিছু বার করে নেওয়া, ফিসফিস করে গল্প করা, হাসি ঠাট্টা করা— এসবের ছাড়পত্র পাওয়া যায় পেছনের বেঞ্চে! তাই প্রচলিত ধারণা যে, শিক্ষকদের একটা অংশ পেছনের বেঞ্চে বসা ছাত্রদের অবহেলা করেন, গুরুত্ব সহকারে তাদের কাছে পৌঁছান না, শুধুমাত্র সামনের বেঞ্চে বসা বুদ্ধিমান অনুগত ছাত্রদের নিয়েই তারা বেশি ভাবিত— এভাবে বিচার করা, বিষয়টার অতি সরলীকরণ ছাড়া কিছু নয়।

এ প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদকের ছাত্র জীবনের একটা ঘটনার কথা বলবো। ১৯৮২ সাল। আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে এসেছেন জেলার অন্যতম নামকরা বিদ্যালয় লক্ষ্মণপুর হাই স্কুলের স্বনামধন্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অবনী লাহিড়ী। তিনি ইংরেজি গ্রামারের প্রিপোজিশন এবং ইডিয়ম-এর সহজ ব্যবহার সম্পর্কিত একটা ছোটো পুস্তিকা লিখেছিলেন। হাতে একটা সেই পুস্তিকা নিয়ে তিনি আমাদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন। প্রথম পিরিয়ড। আমাদের প্রিয় শিক্ষক সুভাষবাবু ইংরেজি পড়াচ্ছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বললেন এবং তাঁর লেখা বই নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষে তাঁর হাতে থাকা পুস্তিকাটা তিনি সামনের সারিতে বসা ছাত্রদের পড়তে দিলেন।

কয়েক মিনিট পর তাঁর আলোচিত preposition-গুলোকে কতগুলো মনে রাখতে পেরেছি তার একটা পরীক্ষা নিলেন। বিদ্যালয় থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। আমি বরাবরই তাড়াতাড়ি স্কুলে পৌঁছাতাম এবং সামনে সারিতেই বসতাম। কোনো কারণবশত সেদিন দেরি করে বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর দরুন আমাকে পেছনে সারিতে বসতে হয়। সামনে বসা ছাত্ররা যত সংখ্যক প্রিপোজিশন মনে রাখতে পেরেছিল আমি তা পারিনি। অবনীবাবু শ্রেণীর ফার্স্ট বয় কে জানতে চাইলে, সুভাষবাবু অঙ্গুলী নির্দেশে আমাকে দেখান। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন— আচ্ছা, তুমি কি সব দিন পেছনের সারিতে বসো? তোমাকে সামনে বসতে হবে। আসলে একটা ছোট্ট শ্রেণীকক্ষে ৫০-৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী। একটা বেঞ্চে খুব কষ্ট করে ছ'জনকে বসতে হতো। অবনীবাবুর পাঠদান চলাকালীন একজন ছাত্র আমার বইয়ের থলি মেঝেতে নামিয়ে দেয়। তাদের বেঞ্চে আমি ছিলাম মূলত এক অনধিকার দখলকারী! হয়তো এটা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

আমার বক্তব্য, এত বড়ো একজন শিক্ষক, পণ্ডিত ব্যক্তি সেদিন কেন বলেছিলেন— তোমাকে সামনে বসতে হবে। তাহলে তিনি কি এভাবে এ কথার মধ্য দিয়ে পেছনের সারিতে বসা ছাত্রদের অবজ্ঞা করেছিলেন? বাস্তবের কষ্টিপাথরে বিচার করলে ব্যাপারটা আদৌ সেরকম নয়। হতে পারে তাঁর সুদীর্ঘ পেশাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন— যারা বিদ্যালয়ে শিখতে আসে তাদের ধ্যান-জ্ঞান পড়াশোনা। তারা পেছনে বসলে পেছনের ছাত্ররা নৈমিত্তিক অভ্যাস মতো তাদের ডিস্টার্ব করবে। তাতে সেই ছাত্রদের ক্ষতি হবে। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা বিবেচনায় তিনি সেদিন এ কথা বলেছিলেন।

আমার দীর্ঘ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এবং প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তা থেকে বলতে পারি পেছনের সারিতে বসা ছাত্রদের পেছনে বসার জন্য কোনো রকমের হীনম্মন্যতা বোধ থাকে না এবং বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা পেছনের সারিতে বসা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে খুব একটা ভাবিতও নন। এটা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা নয়, পেছনের সারিতে বসা ছাত্রদের মানসিকতাই এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা। কয়েকদিন আগের ঘটনা বলি--- আমি বিদ্যালয়ের একটি উইঙের দোতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে দশম শ্রেণীর একটা সেকশনে যাচ্ছি। দেখি, নবম শ্রেণীর একটা সেকশনে ক্লাস চলছে। জনৈকা দিদিমণি পড়াচ্ছেন। হঠাৎ করে জানলা দিয়ে দেখি পেছনের সারিতে একজন ছাত্র বেঞ্চের উপর শুয়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ দিদিমণির সঙ্গে কথা বলে আমি শ্রেণীকক্ষে গেলাম। হঠাৎ শ্রেণীকক্ষে আমাকে দেখে ছাত্রটি হকচকিয়ে উঠে বসে। ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করলাম— তুমি শুয়েছিলে কেন? ছাত্রটি আমতা আমতা করে উত্তর দিল— স্যার আমার অকবকি (দম বন্ধ অবস্থা) লাগছিল।

একটা প্রমাণ আকারের শ্রেণীকক্ষে খুব বেশি হলে ২৫ থেকে ৩০ জন ছাত্র। যথেষ্ট আলো বাতাস তথাপি তার অকবকি লাগছিল! আমি বললাম--- তুমি অসুস্থ অনুভব করে থাকলে, দিদিমণির অনুমতি নিয়ে আমার কাছে যেতে পারতে। ছেলেটি কোনোরকম উত্তর করল না। অন্য পাশের পেছনের সারির ছেলেগুলো অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকলো। ব্যাপারটা এমন যেন, আমরা তো এরকম করেই থাকি। এটা আর নতুন কী! আরেকদিনের ঘটনা বলি। ছোটোদের ক্লাস হয় বিল্ডিঙের যে উইঙে, সেখানে বারান্দায় হাঁটছি। শ্রেণীকক্ষে একটাই জানালা। দেখলাম ছাত্ররা গোলমাল করছে, সামনের দিকে বসা কয়েকটি ছাত্র ক্লাস কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে। মাস্টারমশাই ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক করছেন। পেছনে বসা তিনটি সারির ছেলেরা পেছনের দিকে মুখ করে আপন আনন্দে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, খামচা খামচি করছে, বোতলের জল একজন অন্যজনের মাথায় ঢালছে। আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়েছি, সেটা তারা দেখেনি। অবশেষে আমি যখন তাদের দৃষ্টিগোচর হলাম, পিন ড্রপ সাইলেন্স। আমি দাঁড়িয়ে আছি। ছাত্র ও শিক্ষক সবাইকেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষকমশায় এবার ছাত্রদের দিকে ফিরে তাকালেন। আসলে এরকম কোলাহলের মধ্যে ক্লাস নিতেই বোধহয় তিনি অভ্যস্ত। ছেলেরা যখন হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল, তিনি অবাক হয়ে পেছনে ফিরলেন।

একবার দুই অভিভাবিকার মধ্যে তুমুল ঝগড়া। নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল সহায়কদের হস্তক্ষেপে সেটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তখনো দৈনিক প্রেয়ারের ঘণ্টা বাজেনি। ওরা তাঁদের আমার কাছে নিয়ে আসে। এক মায়ের অভিযোগ তার ছেলের ব্যাগ পেছনের বেঞ্চে সরিয়ে দিয়েছে অন্যজন। অন্যজন বলেন— আমার ছেলে বরাবরই সামনের সারিতে

বসে, এনার ছেলে যখন এসেছে, তখন ওই বেঞ্চে আর বসার জায়গা ছিল না। যার জন্য ব্যাগটি পেছনের সারিতে ফাঁকা বেঞ্চে দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম— আপনি শ্রেণীকক্ষে গেলেন কেন? ছাত্রদের সমস্যা ছাত্ররা আমাকে বলবে, আপনি এভাবে শ্রেণীকক্ষে যাবেন না। আসলে হয় কী, প্রথম দিকের দু-তিন সারির ছেলেরা কখনোই পেছনে বসতে চায় না। পড়াশোনার ভালো ছাত্রদের অভিভাবকদের ইচ্ছাও সেটাই। বাস্তবিকতার নিরিখে বিচার করলে এর মধ্যে অবশ্যই কোনো অন্যায় নেই। তার কারণ, কোনো সচেতন অভিভাবক চাইবেন না তার ছেলেটি পেছনে বসার দরুন শ্রেণী শিখনে অসুবিধেয় পড়ুক। এতৎ সত্ত্বেও বলা যায়, গোল করে বসার একটা বাড়তি টেকনিক্যাল সুবিধে রয়েছে। এতে করে প্রত্যেকেই মাস্টারমশাই বা দিদিমণির সঙ্গে 'আই বল টু আই বল' সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং মাস্টারমশাইয়ের পক্ষে সবাইকে চোখে চোখে রাখার সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে অন্য একটা বিষয় বলি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বৈঠকগুলোতে দেখেছি কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা মেঝেতে গোল করে বসেন। এতে একটা সুবিধা হয়, প্রত্যেক প্রত্যেকের মুখোমুখি বসার সুযোগ পায়। এছাড়া স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সামনে পেছনে বসার আপাত বৈষম্য তৈরি হয় না। মাস্টারমশাইরা ক্লাসে ছাত্রদেরকে ইউ প্যাটার্নে বসালে হয়তো-বা পাঠ দানের ক্ষেত্রে এবং বসার অধিকারে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু পেছনে বসার সুবিধে যে সমস্ত ছাত্র নেয় তাদের প্রতি অবিচারও হবে! শুধু ছাত্ররাই নয়, শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও দেখেছি— বিভিন্ন মিটিঙে কিছু শিক্ষক থাকেন যাঁরা আগে হাজির হয়েও সামনের চেয়ার ফাঁকা রেখে পেছনে বসেন। উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার, সামনে বসলে সভা চলাকালীন সময়ে ইচ্ছেমতো বেরোনো যাবে না। অপরপক্ষে যাঁরা আলোচকদের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে শুনতে চান, কোনো সংশয় থাকলে প্রশ্ন করেন, তাঁরা সর্বদাই সামনে বসেন।

একটা বড়ো শ্রেণীকক্ষে পেছনের বেঞ্চগুলো রেস্তোরাঁ বা ক্যান্টিনের ঠিক ভেতরের ঘরের মতো যেখানে খাওয়াদাওয়া ছাড়াও নিভৃতে পাশাপাশি বসে কিছু ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা, খুনসুটি করার সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যাকবেঞ্চাররা তো ক্লাসের মধ্যেই বসে। তাহলে তাদেরকে অবহেলা করার প্রশ্নটা আসছে কোত্থেকে? আসলে এটা কোনো সমস্যা নয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাবের উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। আমরা যদি মনে করি পেছনের বেঞ্চেও সমান দৃষ্টি দেব, তাহলে এক জায়গায় থিতু না থেকে আমি দুই সারি বেঞ্চের মাঝের প্যাসেজে ঘুরতে ঘুরতে পড়াতে পারি। পেছনের বেঞ্চের ছাত্রদের সঙ্গেও আমার এভাবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারে। এরকম করতে পারলে পেছনের বেঞ্চের তথাকথিত অনুশাসনহীন ছেলেরাও একটুখানি সংযত থাকার চেষ্টা করবে, কষ্টকর হলেও বিষয়ে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হবে।

পরিশেষে বলি, একটা শ্রেণীকক্ষে ইউ প্যাটার্নে ছাত্রদের বসিয়ে পাঠদানের সুবিধা নিশ্চিতভাবেই আছে। কিন্তু যেখানে একটা শ্রেণীতে একশোর বেশি ছাত্র এবং রুমের আয়তন ২০/৩০ সেখানে ইউ প্যাটার্নে একাধিক সারি বেঞ্চ বসাতে হবে এবং সেক্ষেত্রেও একটা পেছনের সারি তৈরি হবে। অতএব সেলুলয়েডে ইউটোপিয়ান ক্লাসরুম সেটআপ বাস্তবের কতখানি সম্ভব দিনের শেষে সেটাও ভেবে দেখা জরুরি। অথচ শ্রেণীকক্ষের পেছনের সারিতে বসা ছাত্রদল এবং শিক্ষকদের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটুখানি পরিবর্তন ঘটাতে পারলে অতি সহজে শ্রেণী শিখনে সুফল পাওয়া যেতে পারে। □

১৬ আগস্ট : খেলা হবে দিবস নাকি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের রক্তস্মৃতি?

বিপ্লব বিকাশ

সম্প্রতি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস্' ছবির ট্রেলারের প্রকাশ অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বন্ধ করে দিল। কারণ একটাই, রাজনৈতিক চাপ। প্রশ্ন আসে, কেন এত ভয়? কেন ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এর স্মৃতিকে সামনে আনা নিয়ে এত অস্বস্তি? কারণ সেই দিনই কলকাতা এক অভিশপ্ত রক্তস্নানের সাক্ষী হয়েছিল। আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেদিনটিকে 'খেলা হবে দিবস' নামে পালনের ডাক দিচ্ছে, সেই দিনটিই আসলে ইতিহাসে লেখা আছে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে হিসেবে। এক ভয়ংকর দিন, এক বেদনাদায়ক অধ্যায়, যা কোনোভাবেই আনন্দের উৎসব হতে পারে না।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট সকাল থেকেই কলকাতা চলে গিয়েছিল জেহাদিদের হাতে। শহরের পথে পথে স্লোগান, আক্রমণ, উন্মত্ত জেহাদিদের উল্লাস। মুসলিম লিগের নেতা সুরাবর্দির ডাকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' শুরু হয়েছিল। দোকান ভাঙচুর, ঘর জ্বালানো, নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা— কোনো নিষ্ঠুরতা বাদ ছিল না। অসংখ্য হিন্দু পরিবার মুহূর্তে ভিটেমাটি হারিয়েছিল, হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল, লক্ষ মানুষ রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়েছিল। সেই দিনগুলো কেবল কাগজের ইতিহাস নয়, বাঙ্গালির বুকের ভেতরে গভীর ক্ষতচিহ্ন।

তাহলে আমরা আজ কীভাবে ভুলে যাই সেই রক্তাক্ত স্মৃতি? কেমন করে ১৬ আগস্টকে স্মরণ করা যায়? আমরা কি ভাবি, যাঁরা মারা গিয়েছিলেন তাঁরা বাঙ্গালি ছিলেন না? তাঁদের রক্তে লেখা ইতিহাস কি আজ আর আমাদের কাছে কোনো অর্থই রাখে না?

সত্যিটা হলো, বাঙ্গালি তার ইতিহাসবোধ হারাতে বসেছে। ভোটের রাজনীতি, তোষণের রাজনীতি আর অন্ধ বিরোধিতার খেলায় আমরা নিজেদের অতীতকে চাপা দিতে শিখেছি। মমতা ব্যানার্জির সরকার যখন ঘোষণা করে ১৬-১৭ আগস্ট হবে 'খেলা হবে দিবস', তখন সেটা কেবল একটি সরকারি কর্মসূচি নয়, এটা এক সুপরিকল্পিত চেষ্টার নাম, যাতে মানুষ ভুলে যায় ১৯৪৬ সালের ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের দিনগুলির কথা। যাতে নতুন প্রজন্ম জানতেই না পারে এই দিনটি বাঙ্গালির জন্য কতটা যন্ত্রণার প্রতীক।

কিন্তু ভুললে কি সত্যিই ভুলে যাওয়া যায়? 'খেলা হবে' কথাটা কি শুধুই মজার স্লোগান? না, এটা আসলে রক্তের স্লোগান। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় এই স্লোগানকেই কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল উত্তাল হিংসা। ফল ঘোষণার পর অসংখ্য পরিবার আক্রান্ত হয়েছিল, বহু নারী নির্যাতিত হয়েছিলেন, বহুসংখ্যক হিন্দু পরিবারকে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

> **ইতিহাসকে মুছে দিতে চাইলে তা আরও প্রবলভাবে ফিরে আসে। তাই আজ প্রয়োজন সবাই মিলে বলা, ১৬ আগস্ট খেলা হবে দিবস নয়, এটা সেই দিন যেদিন বাঙ্গালি রক্তাক্ত হয়েছিল। যেদিন রাজনীতির নামে মানুষকে পশুর মতো হত্যা করা হয়েছিল।**

আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, আবারও বাঙ্গালি আক্রান্ত। তাহলে 'খেলা হবে দিবস' পালন মানে কি তবে রক্তপাতকে উৎসব হিসেবে স্বীকার করা?

যাঁরা ১৯৪৬-এ মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের আত্মা কি শান্তি পেত যদি জানতেন আজ তাঁদের মৃত্যুর দিনকে খেলার দিনে পরিণত করা হয়েছে? কিংবা ২০২১-এর পর যে পরিবারগুলো নিঃস্ব হয়ে গেছে, তাঁদের চোখে অশ্রু ঝরে যখন শুনতে হয়, ১৬ আগস্ট 'খেলা হবে দিবস'? এই উৎসব আসলে আনন্দ দেয় না, কেবলই রক্তচিহ্ন মনে করিয়ে দেয়।

বাঙ্গালিকে বুঝতে হবে, এই দিনটা শোকের দিন, স্মরণের দিন। হুতাত্মাদের প্রতি মাথা নত করার দিন। এটা আনন্দের নয়, উৎসবের নয়। ইতিহাসকে লুকিয়ে রাখলে ভবিষ্যৎও অন্ধকারে হারিয়ে যায়। বাঙ্গালি যদি নিজের রক্তাক্ত অতীত ভুলে যায়, তবে নিজেদের পরিচয়ও হারিয়ে ফেলবে।

আজ বাঙ্গালির কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, আমরা কি রাজনৈতিক স্বার্থে তৈরি 'খেলা হবে দিবস' পালনে হাততালি দেব, নাকি দৃঢ় কণ্ঠে বলব, না, ১৬ আগস্ট আমাদের কাছে এক অতীব শোকের দিন। এটা আমাদের রক্তের ইতিহাস, আমাদের দুঃখের দিন। আমরা ভুলব না। আমরা খেলব না। আমরা স্মরণ করব।

কারণ ইতিহাস চাপা দিলে সত্য হারিয়ে যায় না। ইতিহাসকে মুছে দিতে চাইলে তা আরও প্রবলভাবে ফিরে আসে। তাই আজ প্রয়োজন সবাই মিলে বলা, ১৬ আগস্ট খেলা হবে দিবস নয়, এটা সেই দিন যেদিন বাঙ্গালি রক্তাক্ত হয়েছিল। যেদিন রাজনীতির নামে মানুষকে পশুর মতো হত্যা করা হয়েছিল। আর সেই সত্য বাঙ্গালি কোনোদিনই ভুলব না। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৩৪)

পর্যবেক্ষণ ও চিন্তন মন্থন

১৯২২ সালের ১২ জুলাই কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ডাক্তারজী যখন বাইরে এলেন, দেখলেন অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। গান্ধীজী কারাবন্দি, চৌরিচৌরা কাণ্ড, 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ্য' গান্ধীজীর এই ঘোষণার প্রতি মানুষের অবিশ্বাস— সবমিলিয়ে জনসাধারণের মধ্যে এক হতাশা ও ক্ষোভের পরিবেশ। অপরদিকে গান্ধীজীর 'হিন্দু মুসলমান ঐক্যের' কারণে মুসলমানরা তাদের বিশেষ শ্রেণীর মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। খিলাফত আন্দোলনের নায়কদের বাসনা ছিল ইংরেজদের এখান থেকে উৎখাত করে আফগানিস্তানের আমিরকে গতিতে বসানো। গান্ধীজী নাকি এ ব্যাপারে জানতেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর নাকি এ বিষয়ে সম্মতি ছিল। মুসলমানদের এই অরাষ্ট্রীয় সাংগঠনিক চিন্তা এবং গান্ধীজীর 'হিন্দু মুসলমান ঐক্যের' প্রচেষ্টা বিষয়ে ড. ভীমরাও আম্বেদকর বলেছেন— 'কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য এতদূর পর্যন্ত যেতে পারে!' ডাক্তারজী দেখলেন খিলাফত আন্দোলনের নেতারা 'বন্দেমাতরম্'-এর স্থানে এখন 'আল্লা হো আকবর' বলছে। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন— 'ধার্মিকতার কোনো আকর্ষণ নেই। পাশ্চাত্য ভাবধারার মুসলমানেরাও দাড়ি রাখতে শুরু করে দিল এবং গোঁড়া আচরণ পালন করতে লাগলো'।

একবার ডাক্তারজী কোনো এক পরিষদীয় বৈঠকে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে খিলাফত নেতা সামিউল্লা খাঁ। ডাক্তারজী তখন সাদা খদ্দরের টুপি ও খদ্দরের চাদর ব্যবহার করতেন, কিন্তু সামিউল্লা খাঁয়ের মাথায় দেখা গেল তুর্কি টুপি। ডাক্তারজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সকলের সাদা টুপি পরার কথা হলেও তিনি তুর্কি টুপি পরেছেন কেন? উত্তরে সামিউল্লা খাঁ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ডাক্তারজীকে জানালেন 'আমি প্রথমে মুসলমান এবং এই টুপি তারই প্রতীক। তাই টুপি ত্যাগ করার কোনো প্রশ্নই উঠে না'। মালাবারে মোপলারা হিন্দুদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করলে দেড় হাজারের মতো হিন্দু মৃত্যুবরণ করে। ২০ হাজার হিন্দুকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। কয়েক হাজার হিন্দু মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করা হয়। কংগ্রেস এই নারকীয় ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়, ঘটনাকে খুব ছোটো করে দেখায়।

১৯২৩ কোকোনডো কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য ডাক্তারজী 'হিন্দুস্থানি সেবাদল' গঠন করেন। অনেক নেতা এই সেবাদলের পূর্ণ সমর্থন না করলেও জওহরলাল নেহরু তার প্রশংসা করেন। ডাক্তারজী হুকুম তালিম করা স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে চাননি, তাঁর ইচ্ছা ছিল দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, চরিত্রবান, গুণসম্পন্ন, সীমাহীন সেবাভাব, স্বতঃস্ফূর্ত অনুশাসিত জীবনযাপনে যারা আগ্রহী, তেমন লক্ষ লক্ষ তরুণ তৈরি করতে।

খিলাফত আন্দোলন তুরস্কেই মুখ থুবড়ে পড়লে ভারতের মুসলমানরা প্যান ইসলামিজিমের নামে শুরু করল নানা স্থানে গো হত্যা এবং হিন্দুদের ওপর আক্রমণ। ১৯২৩ সালে সাহারানপুরের আক্রমণ ছিল খিলাফতিদের পরবর্তী চেহারা। নাগপুরে গণেশ উৎসবে গণেশ শোভাযাত্রা, আরতি, ভজন মণ্ডলীর শোভাযাত্রা মসজিদের পাশ থেকে যেতে বাধা দেওয়া হলো। এটাই রীতি ছিল। ডাঃ হেডগেওয়ার ও ডাঃ মুঞ্জের নেতৃত্বে নাগপুরে শোভাযাত্রায় জনসমুদ্র সৃষ্টি করে এই অসৎ উদ্দেশ্য রুখে দেওয়া হলো। অনেক জায়গায় দিণ্ডী যাত্রার (নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শোভাযাত্রা) ওপরে আক্রমণ করা হলো এবং গণেশ বিসর্জন যাত্রায় আক্রমণের ছক তৈরি করা হয়েছিল। ডাক্তারজী ও ডাঃ মুঞ্জে নাগপুর জুড়ে সম্পর্ক ও জনজাগরণ তৈরি করলেন। এবার হাজার হাজার মানুষের শোভাযাত্রায় দেখা গেল প্রত্যেকের হাতে দণ্ড। সে ছিল এক অভূতপূর্ব দণ্ডময় শোভাযাত্রা। এভাবে হিন্দুরা জেগে উঠলে নাগপুরে আক্রমণ, মুসলমানদের পক্ষ থেকে হুমকি, ভয় দেখানো এক সময় বন্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তারজী এমন অনেক ঘটনার বাস্তব পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলেন। এ সব দেখে-শুনে, গভীর চিন্তন-মন্থনের মধ্য দিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ভারতের রাষ্ট্রীয়তাকে বিকৃত করার হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে সকলে মিলে সাগ্রহে হিন্দু সংগঠন করা ছাড়া কোনো পথ নেই। প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাগ্রত করতে হবে সুপ্ত হিন্দু সমাজকে। এই ভাবনাকে বাহন করে এগিয়ে চললেন ডাক্তারজী।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩২

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবীমাহাত্ম্য, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা